মে ১৯৮৬

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

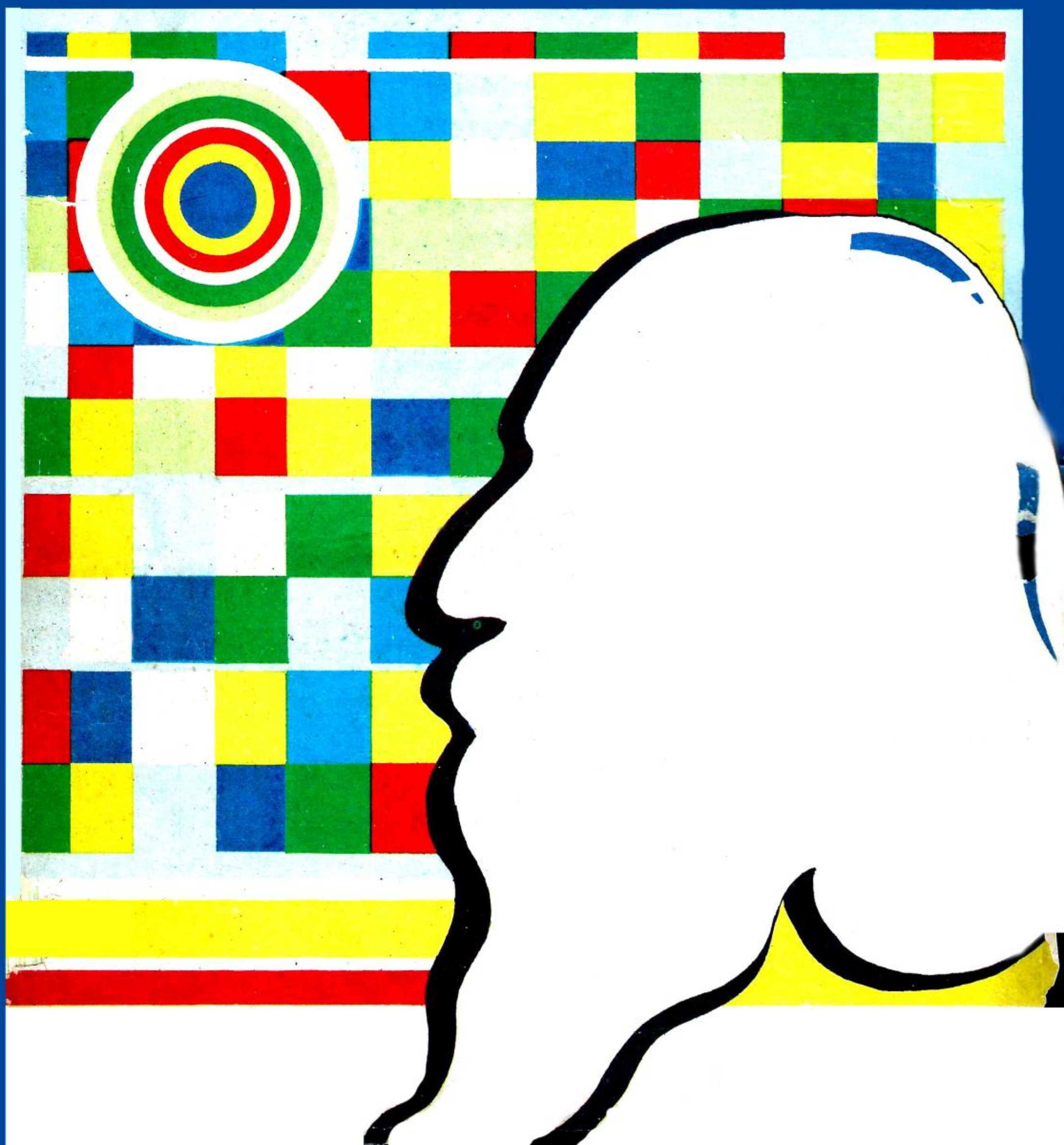

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা ॥ মে '1986

সূচীপত্র

চিঠিপত্র 4 **: দপ্তর থেকে :** রবীন্দ্রনাথের চোখে বিজ্ঞান ॥ সমরজিৎ কর 7

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প : পোকা ॥ স্বব্রত সেনগুপ্ত 47 **:** সবুজ আতংক **:** জয়ন্ত নারলিকার অনুবাদ করেছেন : সৌরেন ভট্টাচার্য 31

বিশেষ রচনা : রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানমনস্কতা ॥ অরূপরতন ভট্টাচার্য 27

পড়াশোনা : রসায়নের প্রথম পাঠ ॥ অমরনাথ রায় 15 **:** ব্যাপন ॥ দিনোজ কুমার দে 16 পদার্থ বিদ্যার কথা ॥ অজয় চক্রবর্তী 17 **:** সংখ্যা 64 ॥ সনৎ কুমার কর 51

ছবিতে গল্প : খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 23 **:** মঙ্গল গ্রহে ঘনাদা (কাহিনী : প্রেমেন্দ্র মিত্র) ॥ গৌতম কর্মকার 43

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী : লীলাবতী ॥ হিরণ্ময় রায় 29 **:** বিজ্ঞানী ভি. এস. মালিক ॥ অমরনাথ রায় 29

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ রচনা : বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ ॥ অরুণ কুমার সেনগুপ্ত 8 **:** বিজ্ঞান সংবাদ 18 **:** মজার ইলেক্ট্রনিক্স প্রজেক্ট ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী 53 **:** গোপাল ভট্টাচার্য স্মরণ সভা 6 **:** চিকিৎসাবিদ্যায় মানবদেহ ॥ ননীগোপাল দাস 41 **:** রঙ করা খাবার ॥ কপিঞ্জল শর্মা 42

আবিষ্কারের গল্প : টেলিভিশনের বিকাশ ॥ পার্থসারথি রুদ্র 28

রঙীন ফিচার : কেমন করে বেলুন ওড়ে ॥ অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ 56 **:** কুশিয়া বালুবাটান ॥ অজয় হোম 57 **:** কার্নালাইট ॥ অমরনাথ রায় 11 **:** গ্রীনল্যাণ্ড আবিষ্কার ॥ কিন্নর রায় 12 বিউমনশিয়া ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস 55

জীবজন্তু ও গাছপালা : শাল গাছ ॥ সুজিত মুখোপাধ্যায় 30

ধারাবাহিক রচনা : ভারতের গবেষণাগার : বসু বিজ্ঞান মন্দির ॥ বিমান বসু 9 অমলথীয়ার রহস্য ॥ নিরঞ্জন সিংহ 19

ছোটদের দপ্তর : উত্তরদাতাদের নাম 59 **:** মডেল ও শব্দকুট প্রতিযোগিতার ফলাফল 60 শব্দকুট ॥ উজ্জ্বল আচার্য 60 : অদৃশ্য প্রহরী ॥ মেহেবুল ইসলাম 61 **:** টেস্টিং বোর্ড ॥ শৌভিক চক্রবর্তী 62 : আই কিউ টেস্ট 62 : প্রশ্নোত্তর ॥ সুধাংশু পাত্র 63 : কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের খবর 66 : বিচিত্র সংবাদ 50 **:** জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট 58 : সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট 14 ফোটো ক্যুইজ 14, 58 :

প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর।

সম্পাদক : রবীন বল। সহঃ সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্র : অলয় ঘোষাল

সাইকেলের আবিষ্কারক

আগস্ট 1985 সংখ্যায় সরোজ কুমার দাস তার লেখার শুরুতেই লিখেছেন - 'সাইকেলের বয়স খুব একটা কম নয়। হবে প্রায় দেড়শ বছরের কাছাকাছি।...প্রথম যিনি সাইকেল নামক যন্ত্রের কথা প্রকাশ করেন তিনি একজন জার্মান, নাম ব্যারন দ্য গ্যাভারবন।' পৃষ্ঠা 37

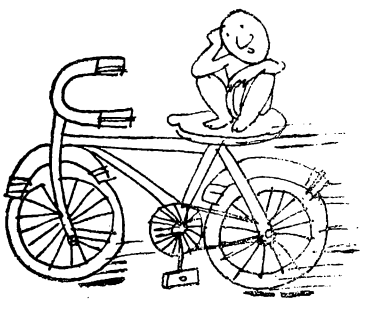

ডিসেম্বর 1985 সংখ্যায় 'সাইকেল আবিষ্কার' শীর্ষক দ্বিতীয় চিঠিতে সুবীর ঘোষ ও রাজীব ঘোষ লিখেছেন—'..ব্যারন ভন ড্রাইস নাকি কথাটির প্রথম প্রচলন করেন।' পৃষ্ঠা 4

জার্মানীর ব্যারন ভন ড্রাইস (Baron Van Drais) 1817 সালে সাইকেল তৈরি করেন এবং তিনি নিজ নামেই সাইকেলের নামকরণ করেন 'draisine' বলে।

উৎস : Children's Knowledge Bank, Volume I (Pustak Mahal, Delhi) IIIrd Reprint Edition August 1983. Page 210

কিন্তু এক্ষেত্রে তিনিই প্রথম ব্যক্তি নন।

আমরা সন-তারিখ-সংখ্যা ইত্যাদি দিয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি হিসেব বা নিরূপণ করি। সন বা তথ্যের দিক থেকে ব্যারন ভন ড্রাইস বা ব্যারন দ্য গ্যাভারবনকে এই বিষয়ে প্রথম ব্যক্তি বলা যায় না।

সাইকেল-এর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমাদের চতুর্দশ শতক অর্থাৎ সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও আবিষ্কারক ইটালির লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci : 1452—1519)-এর সময়ে ফিরে তাকাতে হবে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চিই সর্বপ্রথম 1493 সালে হাতল (Crank) ও পা (Pedal) দিয়ে চালানো সরু লাঠি বা দণ্ড (rod) দ্বারা যুক্ত একটি যন্ত্রের নকশা করেন। তাঁকে একাজে সাহায্য করেন তাঁরই এক শিষ্য।

উৎস : Guinness Book of World Records (March 1981 edition) Page No. 305। 1645 সালে জাঁ থীসন্ নামক ফ্রান্সের ফঁতেরো শহরের এক ব্যক্তি সাইকেল নির্মাণ করার প্রচেষ্টা করেন।

উৎস : ছোটদের বুক অব নলেজ (দেব সাহিত্য কুটীর. কলিকাতা) পঞ্চম সংস্করণ—জানুয়ারী 1985 পৃষ্ঠা 596। স্কটল্যাণ্ডের ডামফ্রিশায়ার-এর কার্ক প্যাট্রিক ম্যাকমিলান (Krik Patrick Macmillan : 1810—1878) প্রথম চড়ন্দার হয়ে চালানোর উপযোগী সাইকেল তৈরি করেন।

উৎস : ছোটদের বুক অব নলেজ, পৃষ্ঠা 596। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে ইংরাজি 'বাই-সাইক্‌ল্' (Bi-cycle) শব্দটির সংক্ষেপই হলো 'সাইক্‌ল্' (Cycle) অর্থাৎ 'সাইকেল', যার অর্থ হলো 'দু-চাকার গাড়ি।'

সমীর কুমার সূত্রধর, শান্তিধাম কালীবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ কলোনী, বঙাইগাঁও-783380, আসাম।

সরোজ কুমার দাসের সাইকেল আবিষ্কারের কাহিনী পড়লাম। 1690 সালে দ্য সিভরাক নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক দুই চাকাওয়ালা একটি গাড়ি নির্মাণ করেন। এর একটি চাকা ছিল সামনে অন্যটি পিছনে। এরপর নতুন ধরনের একটি সাইকেল তৈরি হয় 1779 সালে। পরে কার্ল ভেইজিন নামে এক ইংরেজ একটি গাড়ি তৈরি করেন। বস্তুতঃ প্রায় 295 বছর আগে প্রথম সাইকেল উদ্ভাবিত হয়।

শিবশঙ্কর দাস ও দেব শঙ্কর দাস, মথাডাঙা রামকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয়, হুগলী।

রক্তের তাপমাত্রা, প্রশ্নোত্তর

জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত 'রক্তের তাপমাত্রা' ও 'প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে' মহাদেব চন্দ্র দে (পলাশডাঙা, বাঁকুড়া) প্রেরিত বক্তব্যের সঙ্গে লেখকগণ ঐকমত্য পোষণ করেন। —সম্পাদক

জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা

আমি আজ প্রায় তিন বছর ধরে এই কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। আমি এই পত্রিকা থেকে নানা বিষয়ে নানা রকম সাহায্য পেয়ে থাকি। আমি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে খুবই উৎসাহী। আগে তাও আপনার পত্রিকায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা বিষয় পর্যালোচিত হত, কিন্তু এখন জ্যোতির্বিজ্ঞানমূলক দু-একটি গল্প ছাড়া বিশেষ কিছু আলোচিত হয় না। তাই আমার একান্ত অনুরোধ আমার মত বহু কিশোর-কিশোরীর অতি প্রিয় এই পত্রিকাকে আরো জনপ্রিয় ও আরও সুন্দর করে তোলবার জন্য আপনারা যদি জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা তথ্য নিয়ে কিছু আলোচনা করেন তাহলে খুবই উপকৃত হব। **সম্বিৎসু দাস**। প্রযত্নে—শান্তি দাস, আদরপাড়া, জলপাইগুড়ি।

ধূমকেতু নিয়ে জল্পনা

আমি 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের' একজন প্রিয় পাঠক। 1লা জানুয়ারী 1986 এর সংখ্যায় সমরজিৎ করের 'ধূমকেতু নিয়ে জল্পনা' নামক প্রবন্ধে তিনি প্রথম লাইনে লিখেছেন 'ধূমকেতু এক ধরনের জ্যোতিষ্ক'। কিন্তু আমার মতে ধূমকেতুকে জ্যোতিষ্ক বলা ঠিক কি? কারণ জ্যোতিষ্কদের গঠনে আছে আর্সেনিক, ইরিডিয়াম ও অসমিয়াম কিন্তু ধূমকেতুর গঠনে আছে সায়ানোজেন, জলীয় বাষ্প, কারবন মনোক্সাইড, মিথেন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ।

দ্বিতীয়ত ধূমকেতুর নিজস্ব কোন আলো আছে বলে এমন কোন তত্ত্ব আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। অতএব ধূমকেতুকে জ্যোতিষ্ক বলা আমার মতে ঠিক নয়। **চন্দন রায়**, বিরাটী, শহীদ গণেশ দত্ত রোড, কলিকাতা-51

মাধ্যমিকে কমন

সম্পাদক মহাশয়, আমি এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি। "কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান" পত্রিকার ফেব্রুয়ারি, 1986 সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় শ্রী অমরনাথ রায় মহাশয় কর্তৃক লিখিত "ভৌত বিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী" থেকে এ বছর আমরা 83·33% Common পেয়েছি। এজন্য আমরা আনন্দিত।

সোমা দাস, এন. বি. টি./98/ডি. নিউ ট্রাফিক, পোঃ খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

বিষয়ঃ ভৌতবিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারি, 1986 "কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান"

শতকরা কমন (Common) এসেছে 83·33%

Suggestion এর প্রশ্ন নম্বর	1986 সালের বোর্ডের চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রশ্ন নম্বর	যত নম্বর Common এসেছে
3 (b) ···	1 (ii)	1
3 (c) ···	1 (iii) এবং 1 (iv)	3+1
4 (a)....	1 (iv)	1
3 (c)···	2 ( )	2
3 (b)···	2 (i)	2
4 (a)...	2 (iii)	2
1 (a) এবং 1 (c)....	3 (i)	3
1 (b)	3 (ii)	2+1
1 (b)....	3 (iii)	1
2 (b	3 (i)	1
2 (a)...	3 (ii)	5
2 (b)...	3 (iii)	2
5 (c)....	4 (i)	1
7 (a)...	5 (i) এবং (ii)	3+2
7 (b)···	6 (i)	3
8 (c)···	7 (iii)	2
9 (a)···	8 (i)	2
9 (a)···	8 (ii)	4
9 (b)...	9 (i)	3
9 (d)···	9 (ii) এবং (iii)	5
10···	11 (a)	2
10 (a)···	11 (b)	3
10 (b)···	11 (c)	1
11 (c)...	11 (c)	1
10 (c)···	12 (a)	1
11 (b)···	12 (b)	2
10 (c)....	13 (c)	1
13 (c)....	14 (a)	3
12 (c)....	14 (b)	2
13 (a)....	15 (a)	2
12 (d)···	15 (b)	1
12 (a)···	15 (c)	2
12 (b)···	15 (d)	1
12 (a)···	15 (c)	1
		75

শতকরা Common আসার হিসাব

90 নম্বরের মধ্যে Common এসেছে 75 নম্বর

100 নম্বরের মধ্যে Common এসেছে $\frac{75}{90} \times 100 = 83{\cdot}33\%$

পড়াশোনা

1. সব্যসাচী মহান্তি (বাঁকুড়া), শান্তনু দাস (মেদিনীপুর), মৃণালকান্তি মণ্ডল (মালদা), রেশমী গুপ্ত (সোদপুর), নবেন্দু মণ্ডল (নদীয়া), প্রসূনকুমার জানা (24 পরগনা), বাসুদেব সরকার (মালদা), আশিস (রসপুর হাই-স্কুল, হাওড়া), বর্ণালী পাল (24-পরগনা), খোকন মাইতি (মেদিনীপুর) গোলাম মোর্তজা (মুর্শিদাবাদ), দীপেন্দুবিকাশ ষন্নিগ্রাহী (বাঁকুড়া), মোঃ আমিনুল ইসলাম (মুর্শিদাবাদ), জয়ন্ত সরকার (মুর্শিদাবাদ) ও রাজীব মজুমদার (কলকাতা)।

তোমাদের সবার চিঠিই পেয়েছি এবং চিঠি পেয়ে আনন্দিতও হয়েছি। আনন্দিত হয়েছি এই কারণে যে, তোমরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তোমাদের প্রিয় পত্রিকা "কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান" পড় এবং কোথাও ভুল ভ্রান্তি লক্ষ্য করলে পত্রপাঠ তা সম্পাদকীয় দপ্তরে জানিয়ে দাও।—হ্যাঁ ভাই, তোমরা যেটা লিখেছ সেইটাই ঠিক, অর্থাৎ ব্লিচিং পাউডারের রাসায়নিক সংকেত Ca(OCl)Cl দুর্ভাগ্যবশতঃ মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছে, শেষের Cl-টি বাদ পড়ে গেছে। তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। ইতি, বিবেক রায়

2. চঞ্চল সাহা, দীপঙ্কর সাহা (ঝাড়গ্রাম), কঙ্কন সরকার (কলকাতা-50), মৃণালকান্তি মণ্ডল (মালদা), খোকন মাইতি (কাঁথি), দেবাশিস নস্কর (ভগবানপুর, হাওড়া) এবং সোমা রায়চৌধুরী (কলকাতা-56)

তোমাদেরও ধন্যবাদ জানাই। তোমরাই ঠিক লিখেছ। নাইট্রাস অক্সাইড-এর রাসায়নিক সংকেত N_2O এবং সমআয়তনের কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেনের $(CO+H_2)$ মিশ্রণকে বলা হয় 'ওয়াটার গ্যাস'। এক্ষেত্রেও মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছে। এজন্য দুঃখিত।

ইতি, বিবেক রায়, খড়্গপুর

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের পঞ্চম বার্ষিকী স্মরণ-সভা

কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

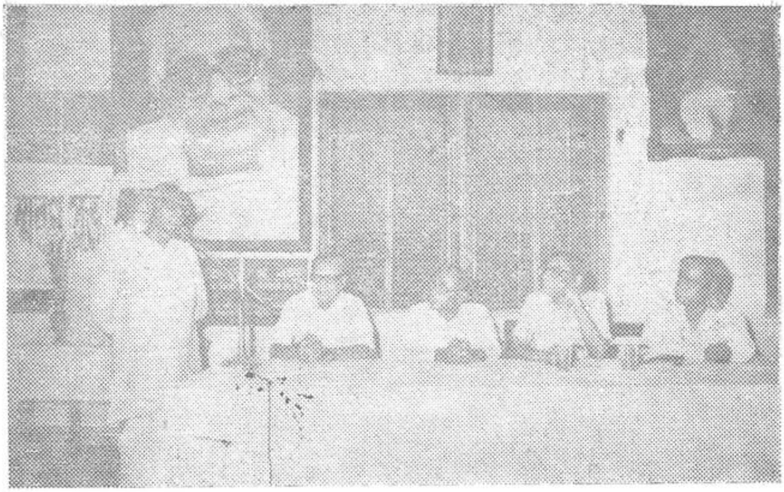

পঞ্চম বার্ষিকী স্মরণ-সভায় বক্তৃতারত প্রবীন সাহিত্যিক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য।
বাঁদিক থেকে : ডঃ বিমালেন্দু মিত্র, শ্রী কান্তি বিশ্বাস, ডঃ জয়ন্ত বসু ও ড. সুকুমার গুপ্ত।

৪ই এপ্রিল, 1986 মঙ্গলবার বিকাল 5টায় 'সত্যেন্দ্র ভবনে' (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কিশোরজ্ঞান-বিজ্ঞান ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির যৌথ উদ্যোগে বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির সমাবেশে প্রয়াত বিজ্ঞানসাধক ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের পঞ্চম বার্ষিকী স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেছিলেন যথাক্রমে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বপ্না চৌধুরী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তারপর প্রয়াত বিজ্ঞানীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন মন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস, ডঃ জয়ন্ত বসু, ডঃ সুকুমার গুপ্ত, ডঃ বিমলেন্দু মিত্র, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক এবং গোপালচন্দ্র বিজ্ঞান প্রসার সমিতির সম্পাদক ডাঃ অনিলবরণ দাস। এরপর বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

শিক্ষামন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যে দেশে ব্যাপক অশিক্ষা, কুসংস্কার ও পুরনো আমলের ধ্যানধারণা সমাজের ওপর যে কুপ্রভাব বিস্তার করছে তার উল্লেখ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্বের কথা তিনি বলেন। বিজ্ঞানচর্চা করে ব্যাপকভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারলে শত সহস্র গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের উদ্ভব ঘটবে। দেশের অগণ্য ছাত্রছাত্রীর মধ্যে গোপালচন্দ্র বেঁচে আছেন বলে তিনি বলেন। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের আদর্শকে পাথেয় করে দেশের প্রান্তে উপান্তে বিজ্ঞানের বার্তা পৌঁছে দিতে পারলে তবেই তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জানান হবে বলে তিনি মনে করেন।

কালিদাস সমাজদার এই অনুষ্ঠানে গোপালবাবুর স্মৃতিতে কলিকাতার কোনো একটি রাস্তার নামকরণ তাঁর নামে করার কথা উপস্থাপন করেন। ডাঃ অনিলবরণ দাস এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর নিজ লেখক জীবনের সূচনায় গোপালচন্দ্রের লেখা কিরূপ উপভোগ করতেন, সেকথা স্মরণ করেন। শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ গোপালচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি মন্ত্রী-মশায়কে ছাত্রদের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান রচনার জন্য গোপালচন্দ্র স্মৃতি মেডেল দেওয়ার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। তাছাড়াও অধ্যাপক হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত, নীহার ভট্টাচার্য, সাংবাদিক নিরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তি গোপালচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, শৈশব থেকেই বহু প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও গোপালচন্দ্রের কৌতূহলদীপ্ত মনের কোনো পরিবর্তন হয়নি। প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর পর্যবেক্ষণই প্রধান। গোপালবাবুর অবদান এই পর্যবেক্ষণ। সভাপতি তাঁর লেখা ও সম্পাদনার দিকগুলি আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে 'সাময়িক পত্র, মিডিয়ার মাধ্যমে জনপ্রিয় বিজ্ঞানালোচনা ও সাধারণের বিজ্ঞান সচেতনতা' শীর্ষক 'গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন ডঃ বিমলেন্দু মিত্র।

সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীঅনিলকৃষ্ণ রায়। চা ও মিষ্টি সহযোগে সভা শেষ হয়।

[ছবিটি তুলেছেন : **শুভংকর মুখোপাধ্যায়**]

দপ্তর থেকে

রবীন্দ্রনাথের চোখে বিজ্ঞান

সমরজিৎ কর

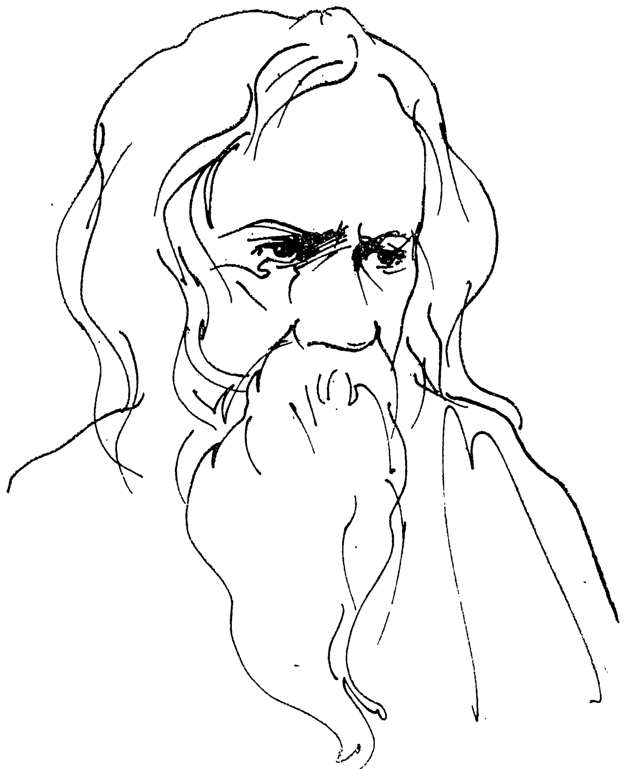

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিজ্ঞানের প্রতি ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। এবং বিশ্বাস। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে তিনি উৎসর্গ করেন তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের একটি সংকলন—বিশ্বপরিচয়। এই সংকলনটির গোড়ায় কবি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের উদ্দেশে লেখেন: 'শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।...মানুষ সহজ শক্তির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় দূরকে করেছে নিকট, অদৃশ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ, দুর্বোধকে দিয়েছে ভাষা। প্রকাশলোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশলোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ করে বিশ্ব ব্যাপারের মূল রহস্য কেবলই অবারিত করছে। যে সাধনায় এটা সম্ভব হয়েছে তার সুযোগ এবং শক্তি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই নেই। অথচ যারা এই শক্তি ও দান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হল তারা আধুনিক যুগের প্রান্তদেশে একঘরে হয়ে রইল।'

বিজ্ঞানের প্রতি এই বিশ্বাস বালক বয়েসেই দানা বেঁধেছিল কবির জীবনে। বয়েস যখন নয় কি দশ, সে সময় সতীনাথ দত্ত নামে জনৈক শিক্ষক মাঝে মাঝে রবিবারে হঠাৎ করে আসতেন তাঁদের বাড়িতে। গল্পের মাধ্যমে নানা রকম দৃষ্টান্ত দিয়ে শিশু কবিকে তিনি বোঝাতেন বিজ্ঞানের নানান তথ্য। পরীক্ষা করে দেখাতেন, 'আগুনে বসালে তলার জল গরমে হাল্কা হয়ে উপরে ওঠে আর উপরের ঠাণ্ডা ভারী জল নীচে নামতে থাকে।' দেখাতেন, মাধ্যাকর্ষণের টান সব বস্তুর উপরই সমান ভাবে কাজ করে। এমন কত রকম পরীক্ষাই না 'করে দেখ'র মত কবির সামনে তুলে ধরতেন তিনি। এসব পরীক্ষা দেখতে দেখতে অবাক হতেন তিনি। কবির কল্পনাকে নাড়া দিয়ে তুলত। বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে গিয়েছিলেন ডালহৌসি পাহাড়ে। সন্ধের পর আকাশ পরিষ্কার। গিরিশৃঙ্গের উপর থেকে স্বচ্ছ অন্ধকার আকাশে একে একে ফুটে ওঠে তারা। বাবা কবিকে পাশে বসিয়ে সেই সব নক্ষত্রের এক একটি চিনিয়ে দিতেন। চিনিয়ে দিতেন, কোনটি নক্ষত্র, কোনটি গ্রহ। গ্রহ এবং নক্ষত্রের মধ্যে পার্থক্যই বা কি। ব্যাখ্যা করে বলতেন, কোন গ্রহ সূর্য থেকে কত দূরে, কিভাবে নিজস্ব কক্ষপথে এক একটি গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, এমন অনেক ঘটনা। বাল্যের এইসব স্মৃতি পরে কবিমনকে বিজ্ঞানের দুর্জ্ঞেয় রহস্য সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছিল। সে সময়ের বিজ্ঞানের যাবতীয় ঘটনা জানার ব্যাপারে তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন।

সত্যিই অবাক হতে হয়। একজন কবি বিজ্ঞানের আধুনিকতম ঘটনাবলী, তথ্য এবং তত্ত্ব সম্পর্কে এতটা ভাবতে পারেন, এ যেন ভাবাই যায় না। কি নেই 'বিশ্বপরিচয়ে'?

কবি তাঁর এই সংকলনে কত রকম ঘটনা নিয়েই না আলোচনা করেছেন। লিখেছেন পরমাণুর কথা। লিখেছেন আলোর বর্ণালীর কথা। 'বিশ্বপরিচয়' পড়লে দেখতে পাবে, বর্ণালীর ব্যাপারটা কত সরল, কত সুন্দরভাবেই না বর্ণনা করেছেন কবি। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: "সূর্যের আলো সাদা। এই সাদা রঙে মিলিয়ে আছে

সাতটা বিভিন্ন রঙের আলো। যেন সাত রঙের রশ্মির পেখম, গুটিয়ে ফেললে দেখায় সাদা, ছড়িয়ে ফেললে দেখায় সাত রঙা।" কবি জানতেন, আলোর বিকাশ ঘটে তরঙ্গ হিসেবে। তরঙ্গের শক্তির উপর নির্ভর করে আলোর বর্ণ। কবি জানতেন উত্তাপ বেশি হলে পদার্থের অণুগুলি বেশি কাঁপে, কম হলে কাঁপে কম। নিউক্লিয়াস, ইলেকট্রন এবং প্রোটনের চরিত্র—এ সবও কবির জানা ছিল। নক্ষত্র জগৎ, মহাকর্ষ, সৌরজগৎ, গ্রহলোক, ভূলোক বা পৃথিবী, অথবা পৃথিবীর বুকে প্রাণের আবির্ভাব—অনেক ব্যাপারে কৌতূহলী হয়েছিল কবির মন। তিনি বুঝেছিলেন, প্রতিটি মানুষেরই প্রকৃতির এ সব ঘটনা সম্পর্কে কিছু না কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। এই জ্ঞান অন্ধ সংস্কার দূর করতে সাহায্য করে। যোগায় আত্মবিশ্বাস।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে কবির সখ্যতা হয়। কলকাতায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' বা 'বোস ইনসটিটিউট' নামে যে গবেষণাগারটি রয়েছে তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সময় পেলেই জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সে সময়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে কথা বলতেন তিনি। জগদীশচন্দ্র প্রাণীর মত বিদ্যুৎ, উত্তাপ অথবা আঘাতে উদ্ভিদও যে সাড়া দেয় তা পরীক্ষা করে দেখাচ্ছেন। গবেষণাগারে তিনি তৈরি করেছেন অণুদৈর্ঘ্যের তরঙ্গ বা 'মাইক্রোওয়েভ'। দেখা হলেও কবি এ সব সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে কত কথাই না জেনে নিতেন!

বিজ্ঞান যাতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সহজভাবে প্রচার করা যায় তার জন্যেও চেষ্টা করেছেন তিনি। কাছে পেয়েছিলেন গুণী শিক্ষক জগদানন্দ রায়কে। তাঁর আদেশে শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের মধ্যে সহজ ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা শুরু করেন জগদানন্দ।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিজেও তিনি বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলার সুযোগ হয়েছিল আমার। তিনি বললেন, ছেলেবেলায় সকালে আমরা গাছের নিচে গিয়ে বসতাম। আমরা মানে ছোটরা। কবিগুরু বসতেন আমাদের সামনে। সেখানে বসে আশ-পাশের গাছপালা, তাদের ফল এবং ফুল আমাদের চিনিয়ে দিতেন তিনি।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিকার্য গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা। গ্রামের মানুষ এই কৃষিকার্যটি যাতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে গড়ে তুলতে পারে সে কথাও ভেবেছিলেন কবি। বোলপুরে নিজের উদ্যোগে গড়ে তোলেন নানা রকম ব্যবস্থা। মাটি তৈরি, সেচের ব্যবস্থা, সারের ব্যবহার—এ সব ব্যাপারে হাতে-কলমে শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। এ কাজে তাঁকে সাহায্য করেন তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ। মাতৃভাষায় সহজ করে বিজ্ঞান প্রচার এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মানুষ যাতে সচ্ছল হয়ে উঠতে পারে, মনের দিক থেকে উন্নত হয় সে ব্যাপারে একটি বড় রকমের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমাদের বিশ্বকবি। তাঁর এই দিকগুলি সম্পর্কে তোমাদের জানা দরকার।

বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স তখন পঁচাত্তর বছর। তিনি একখানা বিজ্ঞান বিষয়ক বই লিখলেন। বইটি প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথের লেখা বিজ্ঞানের এই মূল্যবান বইটির নাম 'বিশ্ব-পরিচয়'। বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ না থাকলে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্ব-পরিচয়ের' মত বই লিখতে পারতেন না।

সেটা বাংলা 1279-80 সাল। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন এগারো থেকে বারো বছর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি হিমালয়ে বেড়াতে যান। এসময় রবীন্দ্রনাথ বাবার কাছে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে পাঠ নেন।

জগদানন্দ রায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়াতেন। তিনি এক ছোট ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দ রায়কে তিনশ টাকা দিয়ে টেলিস্কোপ কিনে দেন।

বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কত অনুরাগ ছিল তা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা এক চিঠিতে জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমার প্রাণের মধ্যে গাছের প্রাণের গূঢ়স্মৃতি আছে, আজ মানুষ হইয়াছি বলিয়াই একথা কবুল করিতে পারিতেছি। শুধু গাছ কেন, সমস্ত জড় জগতের স্মৃতি আমার মধ্যে নিহিত আছে। বিশ্বের সমস্ত স্পন্দন আমার সর্বাঙ্গে আত্মীয়তার পুলক সঞ্চার করিতেছে—আমার প্রাণের মধ্যে তরুলতার বহুযুগের মূক আনন্দ ভাষা পাইয়াছে।'

অরুণকুমার সেনগুপ্ত

একদা জগতের সকলের চেয়ে মহাশ্চর্য বার্তা বহন করে বহু কোটি বৎসর পূর্বে তরুণ পৃথিবীতে দেখা দিল আমাদের চক্ষুর অদৃশ্য একটি জীবকোষের কণা। কী মহিমার ইতিহাস সে এনেছিল কত গোপনে। দেহে দেহে অপরূপ শিল্প সম্পদশালী, তার সৃষ্টিকার্য নব নব পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অনবরত চলে আসছে। যোজনা করবার, শোধন করবার, অতি জটিল কর্মতন্ত্র উদ্ভাবন ও চালনা করবার বুদ্ধি প্রচ্ছন্নভাবে তাদের মধ্যে কোথায় আছে, কেমন করে তাদের ভিতর দিয়ে নিজেকে সক্রিয় করছে, উত্তরোত্তর অভিজ্ঞতা জমিয়ে তুলছে ভেবে তার কিনারা পাওয়া যায় না।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বসু বিজ্ঞান মন্দির

বিমান বসু

কলকাতার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের ওপর সায়েন্স কলেজের পাশে দ্বিতীয় বাড়িটা বাইরে থেকে দেখতে যে কোনও সাধারণ আবাস ভবনের মতই। বাইরে কোনও বড় সাইনবোর্ড নেই, আছে শুধু বড়রাস্তার ওপর সুন্দর কারুকার্য করা কাঠের গেটের দুপাশে ছোট শ্বেতপাথরের দুটি ফলক। তাতে বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা রয়েছে 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'। মৌর্য শিল্পশৈলীর অনুগামী স্থাপত্যের নিদর্শন ঐ সুন্দর গোলাপী রং-এর ভবনটিই সেই জগৎবিখ্যাত গবেষণাগার যা গড়ে তুলতে বিজ্ঞান সাধক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন এবং যেখানে সেযুগে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ স্বদেশী চেষ্টায় যুগান্তকারী গবেষণা চালানো হয়। প্রায় সত্তর বছর আগে স্থাপিত গবেষণাগারটি আজও দেশের আধুনিকতম গবেষণাগারগুলির মধ্যে অন্যতম।

দেশে একটি আধুনিক গবেষণা-মন্দিরের স্থাপনা করা জগদীশচন্দ্রের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল। সেকালে এদেশে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার সুযোগ সুবিধে কেবলমাত্র কয়েকটি সরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগগুলির মধ্যে সীমিত ছিল। নিজস্ব বা ব্যক্তিগত গবেষণার কোনও সুযোগ ছিল না। এমনকি 1897 সালে স্বয়ং জগদীশচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সী কলেজের ল্যাবরেটরিতে নিজস্ব গবেষণা চালানোর জন্য তৎকালীন বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল। ভাবী যুগের বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীরা যাতে এসব বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন না হয়, সে ব্যবস্থা করাও ছিল বসু বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনার এক মুখ্য উদ্দেশ্য।

জগদীশচন্দ্রের মনে বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনার প্রেরণা প্রথম আসে 1897 সালে। সেবছর লণ্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে তিনি বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর মনে রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের মত এক গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলার ইচ্ছা জাগে। কিন্তু তখনই তা করা সম্ভব হয়নি। তাঁর সে স্বপ্ন সফল হতে আরও দশটি বছর লেগেছিল। নিজের সারাজীবনের সঞ্চয় এবং বহু হিতৈষীর দানের অর্থ ব্যয় করে অবশেষে বসু বিজ্ঞান মন্দির গড়ে ওঠে। 1917 সালের 30 নভেম্বর, তাঁর নিজের জন্মদিনে আপার সার্কুলার রোডের নিজ বাসভবনের পাশেই জগদীশচন্দ্র বসুবিজ্ঞান মন্দিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সেদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দিয়েছিলেন যাতে তাঁর অসাধারণ বিজ্ঞান চেতনা ও স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। (তোমরা যদি ভাষণটি পড়তে চাও তাহলে জগদীশচন্দ্রের 'অব্যক্ত' বইয়ে পাবে।)

তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে জগদীশচন্দ্র প্রথম জীবনে পদার্থবিদ্যা নিয়ে চর্চা করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর প্রিয় গবেষণার বিষয় ছিল উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও জীবপদার্থবিজ্ঞান। বসু বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনার পর তিনি এখানেও প্রধানতঃ উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়েই গবেষণা শুরু করেন। তবে কিছুদিনের মধ্যেই এখানে পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্র বিভাগ শুরু করা হয়। বর্তমানে বসুবিজ্ঞান মন্দিরে যে ছয়টি বিভাগে গবেষণা চালানো হয় সেগুলি হলো: (1) পদার্থবিদ্যা, (2) রসায়ন শাস্ত্র, (3) জীব রসায়ন, (4) উদ্ভিদ বিজ্ঞান (5) অণুজীবতত্ত্ব, এবং প্রাণী শারীরবৃত্ত। পৃথক একটি 'টিস্যু কালচার' ল্যাবরেটরিও এখানে রয়েছে। আরও আছে যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ওয়ার্কশপ।

জগদীশচন্দ্র বসুবিজ্ঞান মন্দিরকে উদ্ভিদবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণা-কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেজন্যই এখানে সর্বপ্রথমে উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগটি খোলা হয়। গত সত্তর বছরে এখানে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা চালানো হয়েছে। তার মধ্যে লজ্জাবতী লতার সংবেদনশীলতা, বন চাঁড়ালের পাতার স্পন্দন এবং উত্তাপ, আঘাত ও বিষ ইত্যাদির প্রতি বিভিন্ন উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে যুগান্তকারী গবেষণা জগদীশচন্দ্র নিজেই চালিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে গবেষণাক্ষেত্র আরও বেড়েছে। বর্তমানে গবেষণার বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে উদ্ভিদ প্রজনন বিজ্ঞান,

বসু বিজ্ঞান মন্দির। বাঁদিকের বাড়িটি জগদীশচন্দ্রের বাসভবন

পরাগবিজ্ঞান, ইকোলজি ও পরিবেশ সংক্রান্ত জীববিজ্ঞান ইত্যাদি। বিভিন্ন শস্য ও ফসল নিয়ে পরীক্ষা চালানোর উদ্দেশ্যে কলকাতার কাছেই ফলতা, শ্যামনগর এবং মধ্যমগ্রামে তিনটি শাখা কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

উদ্ভিদ নিয়ে জগদীশচন্দ্র যেসব পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তার বেশিরভাগই ছিল জীবপদার্থবিজ্ঞান সংক্রান্ত অধ্যয়ন। সে সব পরীক্ষার জন্য যে সব যন্ত্র তিনি তৈরি করেছিলেন সেগুলি ছিল পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের ওপরেই ভিত্তি করে। লিভার (lever), আলোর প্রতিফলন, তড়িৎ চুম্বক ইত্যাদি অতি সাধারণ কয়েকটি জিনিসকে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগিয়ে তিনি উদ্ভিদের মধ্যে অতি সূক্ষ্মতম প্রাণের স্পন্দন ও প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগটি খোলা হয়। জগদীশচন্দ্র নিজে একসময় পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। সুতরাং পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সে সময়কার উল্লেখনীয় আবিষ্কারগুলি সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁর জীবনকালে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে আলট্রাসোনিকস্ (ultrasonics), মহাজাগতিক রশ্মি, বর্ণালী বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কিছু কিছু কাজ শুরু করা হয়েছিল। তবে পুরোদমে গবেষণার কাজ শুরু হয় জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর, যখন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষের পদে আসেন সুবিখ্যাত পরমাণু-বিজ্ঞানী দেবেন্দ্র মোহন বসু। আজ এই বিভাগে যে সব বিষয় নিয়ে গবেষণা চালানো হয় তার মধ্যে রয়েছে—নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা, কণিকা ত্বরক বিজ্ঞান, তেজস্ক্রিয়তা ও আয়নমণ্ডলের অধ্যয়ন। মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণার জন্য দার্জিলিংএ বসুবিজ্ঞান মন্দিরের একটি শাখা কেন্দ্র রয়েছে।

বসুবিজ্ঞান মন্দিরের রসায়ন বিভাগটিও স্থাপনার কয়েক বছরের মধ্যেই খোলা হয়। শুরুতে এখানে প্রধানতঃ বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ পদার্থ নিয়েই গবেষণা চালানো হত। পরবর্তীকালে মেদ রসায়ন ও রাসায়নিক সংশ্লেষণ এবং বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ ঔষধি নিয়েও গবেষণা চালানো হয়েছে।

1942 সালে বসুবিজ্ঞান মন্দিরে দেশের প্রথম অণুজীবতত্ত্ব (microbiology) বিভাগ খোলা হয়। এখানে পেনিসিলিন, নিওমাইসিন ইত্যাদি অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনকারী ছত্রাক নিয়ে গবেষণা চালানো হয় এবং কয়েকটি নতুন জীবাণু প্রতিরোধী ওষুধের সন্ধানও পাওয়া যায়। পরে চাষের উপযোগী নাইট্রোজেন গ্রহণকারী ব্যাকটেরিয়া, গাঁজন প্রক্রিয়ার (fermentation) দ্বারা সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদক ব্যাকটেরিয়া এবং জৈব আবর্জনা বিঘটনকারী ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা চালানো হয়েছে। এই সব ব্যাকটেরিয়া মানুষের বহু কাজে আসে আর সেজন্যই এদের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

জগদীশচন্দ্র যে সময় গবেষণায় রত ছিলেন সে সময় আজকের মত তৈরি যন্ত্রপাতি পাওয়া খুবই দুষ্কর ছিল। তাছাড়া সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি তো একেবারেই ছিল না। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রসামগ্রী গবেষককে নিজেই কারিগর দিয়ে তৈরি করিয়ে নিতে হত।

জগদীশচন্দ্রকেও তাই করতে হয়েছিল আর সেজন্যই তিনি শুরু থেকেই বসুবিজ্ঞান মন্দিরে একটি ভাল ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঐ ওয়ার্কশপের জন্য তিনি বিদেশ থেকে বহু যন্ত্রপাতি আনিয়েছিলেন আর তা চালানোর জন্য বাছাই করা দক্ষ কারিগর জোগাড় করেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ঐ সব ভারতীয় কারিগর যে সব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরি করেছিলেন তা দেখে সে যুগের বিদেশী বিজ্ঞানীমহলও অবাক হয়ে গিয়েছিল। এদের মধ্যে একটি যন্ত্র যার নাম 'কমপাউন্ড লিভার ক্রেসকোগ্রাফ্' উদ্ভিদের বৃদ্ধির হারকে 10,000 গুণ বাড়িয়ে দেখাতে পারে। 'ম্যাগনেটিক ক্রেসকোগ্রাফ' যন্ত্রটি আরও বেশি সূক্ষ্মদর্শী, এতে ঐ বৃদ্ধির হার প্রায় পাঁচ কোটি গুণ পরিবর্ধিত হয়ে ধরা পড়ে। এসব ছাড়া উদ্ভিদের শ্বসনক্রিয়া, উদ্ভিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সংকেত প্রবাহের গতি, আঘাত বা বিষক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করার যন্ত্রও জগদীশচন্দ্র তৈরি করেছিলেন যা আজও সযত্নে বসুবিজ্ঞান মন্দিরে রাখা আছে।

বসু বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনার পর 1937 সাল পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র নিজেই ঐ ওয়ার্কশপের কাজকর্ম দেখতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পরিকল্পিত সবকটি যন্ত্র তাঁর জীবনকালে বাস্তব রূপ নেয়নি। বেশ কয়েকটি যন্ত্র কেবল মাত্র নক্সা অবস্থায়ই রয়ে গেছে। সম্প্রতি এখানকার ওয়ার্কশপে ঐ সব যন্ত্র তৈরির কাজ চলছে। তবে সে যুগের তুলনায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ওয়ার্কশপ আজ অনেক বেশি আধুনিক। বিজ্ঞানমন্দিরের বিভিন্ন বিভাগে গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্কশপের কার্যক্ষেত্রের পরিধিও বেড়েছে। রেফ্রিজারেশন ও ইলেকট্রনিকস্ ইউনিট চালু হয়েছে। আজ এখানে সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ এবং বিভিন্ন ধরনের কাঁচের উপকরণ থেকে শুরু করে পারমাণবিক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বিশাল 250 কেভি কণিকা ত্বরক যন্ত্র নির্মাণের ব্যবস্থা আছে।

কাঁকুরগাছিতে বসুবিজ্ঞান মন্দিরের একটি নতুন ভবন খোলা হয়েছে। ভবনটির নাম রাখা হয়েছে 'জগদীশচন্দ্র বসু শতবার্ষিকী গবেষণাগার ভবন'।

7-UF. College Road New Delhi-110001

চেনা-অচেনা ধাতু

কার্ণালাইট

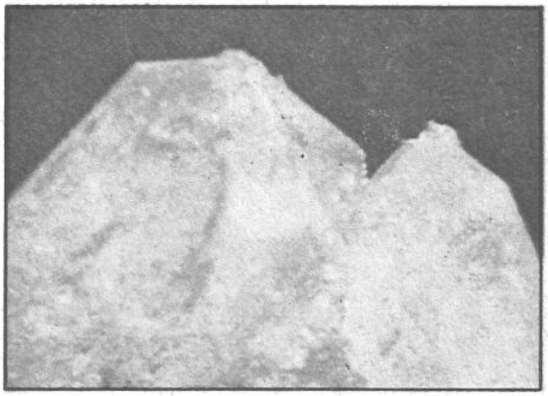

'কার্নালাইট' এক ধরনের জটিল লবন। এর রাসায়নিক সংযুতি হলো $KC . MgCl_2 . 6H_2O$.। এর কেলাস কিন্তু বড় একটা পাওয়া যায় না। সাধারণত এই খনিজটিকে আকৃতিহীন সূক্ষ্ম দানার আকারে পাওয়া যায়। একে নরমই বলা চলে, কারণ মোজ (Moh's) স্কেলে এর কাঠিন্য 2·5 এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব 1.60। কেলাসবিদ্যা অনুযায়ী এর কেলাস অর্থোরম্বিক শ্রেণীভুক্ত। কার্ণালাইট ভঙ্গুর, ঝকঝকে এর স্পষ্ট দুর্বলতা তল (Cleavage) নেই। কার্ণালাইট এর স্বাদ নোনতা নয়, বরং তেতো। কার্ণালাইটকে তাপ দিলে বা অন্য উপায়ে উত্তেজিত করলে এর থেকে আলোক নির্গত হয়। উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে আমরা যে সব সার জমিতে প্রয়োগ করি তার মধ্যে পটাসিয়ামযুক্ত সারের প্রয়োজন মেটায় এই 'কার্নালাইট'। কার্ণালাইটের উল্লেখযোগ্য ভাঁড়ার আছে উত্তর জার্মানী, স্টাসফুর্ট, সিলেশিয়া ও স্যাক্সনী প্রভৃতি অঞ্চলে। এ ছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্ণালাইট উৎপাদনকারী দেশগুলি হলো আমেরিকা, রাশিয়া, স্পেন ও কানাডা। ভারতে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে, যেখানে সমুদ্রের জল থেকে খাদ্য লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড সংগ্রহ করা হয়, সেখানেও কার্নালাইট পাওয়া যায়।

অমরনাথ রায়

আগামী সংখ্যা থেকে
এইচ. জি. ওয়েলস-এর
দুর্ধর্ষ কাহিনী
অবলম্বনে

শিল্পী গৌতম কর্মকার
রূপায়িত
দি ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ডস
শুরু হচ্ছে

গ্রীণল্যাণ্ড আবিষ্কার

সভ্যতা এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ চেয়েছিল দূরকে নিকট আর পরকে আপন করতে। দূর দূর দেশে বাণিজ্যের জন্যে তারা বেরিয়ে পড়ত পালতোলা নৌকোয় চেপে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, সামুদ্রিক পথের নানা বাধা-বিপদ তুচ্ছ করে। শুধু জলেই নয়, স্থল-পথে ও পায়ে হেঁটে, ঘোড়ার পিঠে চলত এই অভিযান পর্ব। যিশু খ্রিস্টের জন্মের অনেক আগেই ভারতীয়রা যেতেন বাণিজ্যে সুমাত্রা, বালি, যবদ্বীপে।

ইউরোপে শিক্ষা বিপ্লবের পর এই অভিযান-পর্ব আরও ব্যাপক হয়। নতুন নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কার করতে চায় মানুষ। পালতোলা জাহাজের বদলে বাষ্পীয় পোত তাদের নতুন যাত্রাসঙ্গী হয়ে ওঠে। জল, শুধু জল পেরিয়ে মানুষ খুঁজে পায় নতুন দেশ, নতুন মানুষ, নতুন বাজার। ভারতবর্ষ, আমেরিকা, আফ্রিকা, উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু—সবই আস্তে আস্তে পরিচিত হয়ে ওঠে ইউরোপের কাছে। ইউরোপের দেশগুলি রাতারাতি মালিক হয়ে ওঠে অনেক উপনিবেশের।

আমরা প্রত্যেক সংখ্যায় আলোচনা করব মানুষের এমনই এক একটি বিস্ময়কর অভিযান-কাহিনী। যার রোমাঞ্চকর আখ্যান-পর্ব অবাক করে দেবে তোমাদেরও।

এবারের লেখার সঙ্গে যে নৌকোর ছবি তার অভিযান পর্বের সময় 1000 খ্রিস্টাব্দ। 1962 সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনের কাছে এই প্রাচীন নৌকোটিকে পাওয়া গেছিল। স্ক্যান্ডিনেভিয়া, গ্রীণল্যান্ড এবং আইসল্যান্ডের ভেতর যোগাযোগ রাখত এই ধরণের নৌকো। এই সব নৌকোর নাম ছিল 'knarr' মাল বওয়া লোক চলাচল—এ সব কাজেই এদের ব্যবহার। যুদ্ধজাহাজ 'ড্রাগন শিপ'-এর জাতভাই বলা যেতে পারে এদের।

54 ফুট লম্বা আর 14 ফুট চওড়া এই জাহাজ যুদ্ধ-জাহাজের থেকে সামান্য ছোট আর সরু। পাইন কাঠ, ওক কাঠ আর আলকাতরায় ডোবানো জীবজন্তুর লোম দিয়ে তৈরি এর গা। পাল উড়িয়ে সাগর বেয়ে চলে যেত এই সব জাহাজ। পেটের ওপর লাগানো থাকত স্থায়ী মাস্তুল। এতে নিয়ে যাওয়া হতো মালপত্র, গরু বাছুর, ঘোড়া। বৃষ্টি থেকে বাচার জন্য আধা ডেকের মতো একটা ব্যবস্থা ছিল। দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় জ্বালানো যেত না আগুন। ঠাণ্ডা খাবার, আর পানীয়—এই তো ছিল ভরসা।

এরিক নামের এক নাবিক একটি দ্বীপে কাটিয়েছিলেন তিন বছর। সেখানে শিকার, মাছ ধরে কেটে গেল দিনগুলি রাতগুলি। তারপর এরিক ঘরে ফিরে এসে 986 খ্রিস্টাব্দে যাত্রা করলেন গ্রীণল্যান্ড। সঙ্গে 25টা নৌকো। কিন্তু মাত্র 14টা নৌকো নিয়ে 450 জন মানুষ পেঁছিলেন গ্রীণল্যান্ডে। বাকিরা কষ্টের যাত্রা সহ্য করতে পারেন নি।

লাল দাড়ির মানুষটি গ্রীণল্যাণ্ডে রীতিমতো জমিদারি সাজিয়ে বসলেন। তাঁর তিন ছেলে এক মেয়ে। সমুদ্রের তীর ধরে 120 মাইলের মতো খামার বাড়ি। গ্রীণল্যাণ্ডে ক্রমে অধিবাসীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিন হাজার। এভাবেই দিন চলল এগিয়ে।

তারপর 986 সালে একজন নরওয়ের ব্যবসায়ী আইসল্যাণ্ড থেকে পাড়ি দিলেন গ্রীণল্যাণ্ডে, তাঁর সঙ্গে একইরকম জাহাজ—যে জাহাজের ছবি তোমরা দেখছ পরের পাতায়। তিনি আরও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে ঘন বনজঙ্গলে ভরা আরও একটি দেশ আবিষ্কার করলেন। বুঝতে পারলেন এটা গ্রীণল্যাণ্ড নয়। কিন্তু তাঁর এই দ্বীপে পেঁছনোর খবর অনেককেই উদ্বুদ্ধ করল অভিযানে যাত্রা করতে। যে অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়—ধনসম্পদ, সোনাদানা, মণিমুক্তো।

এভাবেই এগিয়ে চলল মানুষের অভিযান কাহিনী, যা রহস্য রোমাঞ্চের গল্পকথাকেও হার মানিয়ে দেয়। পরবর্তী সংখ্যা গুলোতে তোমরা পাবে তারই এক একটা আলাদা বিবরণ।

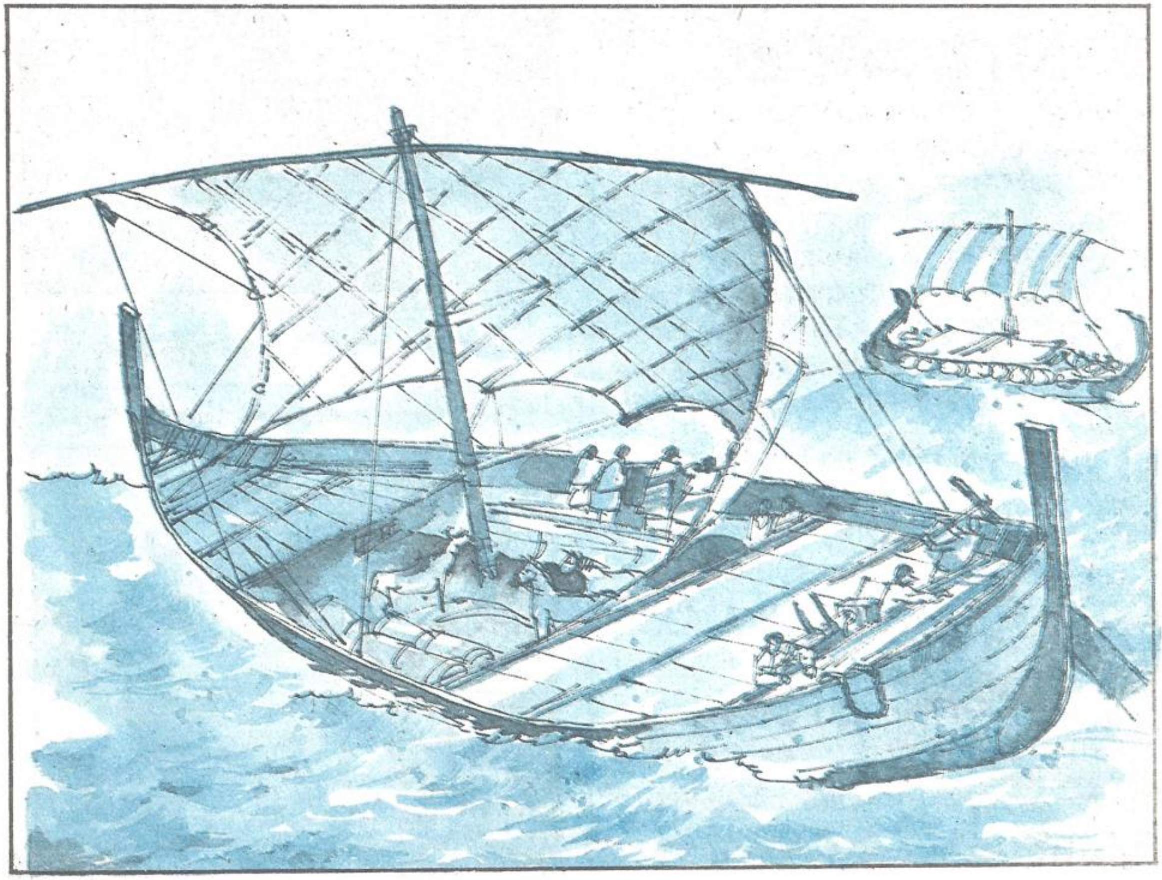

কিন্নর রায়

সিনিয়র কুইজ কনটেস্ট

মান : IX/X শ্রেণী মে' 1986

1. সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই নায়কের নাম কি ?
2. পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাঁধ কোনটি ?
3. কোন্ আকরিক থেকে সাধারণত অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করা হয় ?

5. কোন্ শ্বসনে আংশিক শক্তি নির্গত হয় ?
6. সৌদি আরবের বৃহত্তম শহরটির নাম কি ?
7. আরশোলা, চিংড়ী প্রভৃতি প্রাণীর রক্তে তাম্রঘটিত একটি প্রোটিন থাকে ; যার উপস্থিতির জন্যে এদের ঈষৎ সবুজ দেখায়।—ঐ তাম্রঘটিত প্রোটিনের নাম কি ?
8. নিচের কোন্ যৌগটি তড়িৎযোজী ?

(ক) CO_2 (খ) NaCl (গ) PH_3

9. সি. জি. এস. পদ্ধতিতে ক্ষমতার ছোট এককের নাম কি ?

11. একটি গল্ফ বলের সর্বাধিক ওজন কতো আউন্স ?
12. 'লেডি বার্ড' পাখি নয় ; তবে কি ?

4. এটি একটি জাতীয় পাখি। কোন দেশের জাতীয় পাখি ? এর নামই বা কি ?

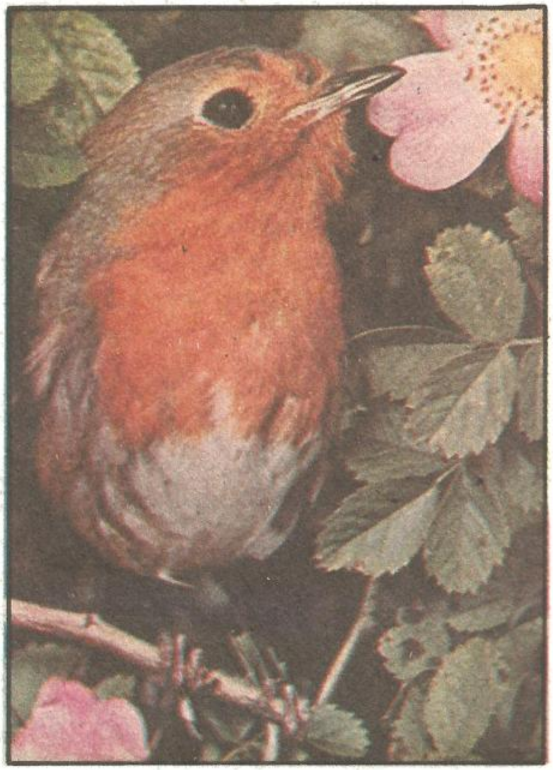

ফোটো কুইজ

10. এগুলি ফুল না ফল ? নামই বা কি ?

পড়াশোনা

রসায়নের প্রথম পাঠ ১ অমরনাথ রায়

এক ঃ রসায়নের জন্মকথা

অনেক অনেক কাল আগে শিক্ষা-দীক্ষায় যে সব দেশ বেশ উন্নত ছিল, 'মিশর' তাদের মধ্যে অন্যতম। আরবী ভাষায় মিশর দেশকে তখন বলা হতো 'অল কিমিয়া', তার মানে 'কালো মাটির দেশ'। মিশরীয়রা তাদের দেশের কালো মাটি দিয়ে সুন্দর সুন্দর বাসনপত্র তৈরি করতো, মূর্তি তৈরি করতো। কালো মাটির শিল্পকে সে দেশে বলা হতো 'কিমিয়া'। শুধু তাই নয়। মিশরীয়রা সেকালে নানারকম ধাতু ও লতাগুল্ম থেকে বলদায়ক রস (টনিক), সুগন্ধি ও প্রসাধন সামগ্রী তৈরি করার কলাকৌশলও জানতো। সেই কলাকৌশলও 'কিমিয়া' নামে পরিচিত ছিল। আরব দেশে কিমিয়াবিদ্যা পরবর্তীকালে 'অ্যালকেমি' নামে পরিচিত হ'য়ে ওঠে। আর অ্যালকেমি থেকেই জন্ম নেয় 'কেমিস্ট্রি' বা রসায়ন বিজ্ঞান। যাই হোক্, আমরা 'অ্যালকেমি' বলতে বুঝি প্রাচীন ও মধ্যযুগের রসায়নকে।

ইতিহাস বলে যে মানব সভ্যতার সূচনা হয়েছিল যে সব দেশে, তাদের মধ্যে মিশর, চীন, গ্রীস ও ভারতবর্ষ ছিল অন্যতম। প্রাচীনকালে এইসব দেশের প্রত্যেকটিতেই কিমিয়া বিদ্যার চর্চা হতো। খ্রীস্টজন্মের বহুকাল আগে থেকেই এইসব দেশের কিমিয়াবিদেরা সোনা, রূপা, তামা, সীসা, লোহা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার জানতো। সোনার গুণের কথা তাদের অজানা ছিল না। তাই অন্যান্য ধাতুর চাইতে সোনাকেই তারা বেশি পছন্দ করতো। লোহা, তামা, সীসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর ধাতুকে তাই তারা সোনায় পরিণত করার চেষ্টা করতো। শুধু কি তাই ?

—নানা রকম ভেষজ লতাপাতা থেকে নির্যাস বের করে তারা 'অমৃত রস' তৈরিরও চেষ্টা করতো। এই অ্যালকেমিস্ট বা কিমিয়াবিদ্‌দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তারা নিকৃষ্ট ধাতুকে বরধাতু সোনায় রূপান্তরিত করতে পারবে; পারবে অমৃতরসও বানাতে।

সেই অমৃতরস পান করে মানুষ জরা, ব্যাধি প্রভৃতি মানবীয় দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে, অমর হবে। অ্যালকেমিস্টদের বিশ্বাস ছিল এই যে, প্রতিটি বস্তুতেই আছে একটি মূল উপাদান। বস্তুটিকে আগুনে ঝলসিয়ে, কখনও বা পাতন, উর্ধ্বপাতন প্রভৃতি পদ্ধতি প্রয়োগ করতে করতে হয়তো বা একদিন মিলবে 'পরশ পাথর', যার স্পর্শে নিকৃষ্ট ধাতু পরিণত হবে সোনায় অথবা কোন উদ্ভিজ্জ নির্যাস পরিণত হবে অমৃত রসে — যা পান করে মানুষ লাভ করবে অমরত্ব।

অষ্টম শতাব্দীতে আরব দেশের শ্রেষ্ঠ কিমিয়াবিদ ছিলেন 'জাবির'। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ কিমিয়াবিদ ছিলেন 'রজার বেকন'। নবম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কিমিয়াবিদ ছিলেন নাগার্জুন। তিনিই সর্বপ্রথম পারদ ও গন্ধকঘটিত পদার্থ 'কজ্জলী' ব্যবহার করেন। কিমিয়াবিদ্যাকে যে সব কিমিয়াবিদ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করার কাজে ব্রতী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে জাবির, ইবনসিনা, রজার বেকন ও প্যারাসেল সাসের নাম অন্যতম। এঁরাই শুরু করেছিলেন ভেষজ রসায়নের অনুশীলন। ভারতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের পত্তন হয়েছিল এমনি ভাবেই।

খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে অ্যালকেমি চর্চা কতকগুলি মানুষের ছলনা, বুজরুকি ও প্রতারণার হাতিয়ার রূপে দেখা দেয়। তার ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলি সোনা তৈরির বাজিকর; প্রবঞ্চক ও প্রতারকে ভরে যায়। লোকে অ্যালকেমিস্টদের তখন সন্দেহ ও ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করে। কিমিয়াবিদ্যা তখন থেকে বুজরুকি বিদ্যা বলে নিন্দিত হতে থাকে।

কিমিয়াবিদ্‌দের আশা কিন্তু কোনদিনই পূরণ হয় নি। তারা পরশপাথর খুঁজে পায় নি। অমৃত রসও তৈরি করতে পারে নি। তাদের অসাফল্যের যে সব কারণ ছিল তার মধ্যে একটি হলো—পরীক্ষার ফলাফলের গোপনীয়তা। দুর্বোধ্য সাংকেতিক ভাষায় তারা তাদের পরীক্ষার ফলাফল লিখে রাখতো। পরবর্তীকালের নবীন কিমিয়াবিদরা সেইসব সাংকেতিক ভাষায় লেখা বিষয়ের মর্মোদ্ধার করতে পারেনি। পারেনি কাজে লাগাতে পূর্বসূরীদের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান।

কিমিয়াবিদ্‌দের যখন চরম দুর্দশার দিন চলছে তখন একদল বাস্তববাদী মানুষ এগিয়ে আসেন মানুষের মনের গূঢ়তম জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে। এঁরা তত্ত্ব ও তথ্যকে একই সূত্রে গাঁথবার চেষ্টা করেন। এঁদের চেষ্টায় কিমিয়াবিদ্যার অবলুপ্তি ঘটে এবং তার জায়গায় স্থান পায় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি।—এমনিভাবে বহুযুগ পরে কিমিয়াবিদ্যার জায়গায় গড়ে ওঠে বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা, নাম যার 'রসায়ন' বা কেমিস্ট্রি। (ক্রমশঃ)

ইন্দা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর

ব্যাপন দিনোজকুমার দে

তোমরা সকলেই জান, ঘরের মধ্যে সুগন্ধি ধূপ জ্বালালে ধূপের গন্ধ ঘরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে অথবা রান্নাঘরে সুস্বাদু খাবার তৈরি হলে খাবারের সুগন্ধে ঘর ভরে যায়। কিন্তু কিভাবে সুগন্ধে ঘর ভরে যায় অথবা সুগন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে জান? তোমাদের নিশ্চয়ই মনে হয় এটা স্বাভাবিক কারণে ঘটে থাকে। তাই না? আসলে কিন্তু এর পিছনে বৈজ্ঞানিক কারণ নিহিত আছে। যা তোমাদের জানা একান্তই প্রয়োজন। এই সুগন্ধ ছড়িয়ে যাওয়া ব্যাপারটা ঘটে ব্যাপনের দ্বারা। এখন তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে 'ব্যাপন' কি? সেটি বলি শোন। পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তুই অণু দিয়ে গঠিত এবং এই অণুগুলি সবসময় গতিশীল। সেই রকম সুগন্ধি গ্যাসও অণু দিয়ে গঠিত। আর ঘরের মধ্যে যে বায়ু বা বাতাস থাকে সেও অণু দিয়ে গঠিত। কিন্তু সুগন্ধি গ্যাসের অণুগুলি ঘরের ভিতরের বায়ু বা বাতাস অপেক্ষা ঘন বা গাঢ়। আর বাতাস বা বায়ুর অণুগুলি সুগন্ধি গ্যাসের অণু অপেক্ষা কম ঘন বা লঘু। তাই সুগন্ধ গ্যাসের অণুগুলি লঘু ঘনত্ব বাতাসের দিকে ধেয়ে যায়। ফলে সারা ঘরের বাতাস ঐ সুগন্ধে ভরে যায়। এই ভিন্ন ঘনত্বের গ্যাসের অণুর যাতায়াতকেই বলা হয় ব্যাপন। শুধুমাত্র গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রেই হয় না। তরলে—তরলে, তরলে—গ্যাসে, গ্যাসে—গ্যাসে এমনকি তরলে—কঠিনেও হতে পারে। তোমরা একটি সহজ পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে পার তরলে—কঠিনেও ব্যাপন হয়। এক বালতি স্বচ্ছ জল নাও। ঐ জলে একটি নীলের বড়ি ফেলে দাও। দেখবে নীলের বড়ি ধীরে ধীরে গলছে—এবং জলের রঙ ধীরে ধীরে নীল রঙ ধারণ করছে। আসলে নীলের বড়ির অণুগুলির ঘনত্ব জলের অণুগুলির ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি। তাই নীলের বড়ির অণুগুলি জলের অণুর মধ্যে গিয়ে জলের রঙ নীল করছে। সুতরাং বুঝতে পারছ ব্যাপন কেবলমাত্র গ্যাসে—গ্যাসে না হয়ে তরল—কঠিনেও হতে পারে। ব্যাপন প্রক্রিয়ায় দুটি পদার্থের ঘনত্ব সমান হলেও কিন্তু অণুগুলির সঞ্চারণ বন্ধ হয় না। অণুগুলির সঞ্চারণ হতেই থাকে।

ব্যাপনের সঙ্গে কয়েকটি শর্ত জড়িত। যেমন তাপমাত্রা বা উষ্ণতা বাড়লে ব্যাপনক্রিয়া দ্রুত হয়। ঠিক তেমনি উষ্ণতা কমলে ব্যাপনক্রিয়া হ্রাস পায়। যেমন গরম জলে চিনি তাড়াতাড়ি দ্রবীভূত হয় কিন্তু ঠাণ্ডা জলে চিনি দ্রবীভূত হতে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগে। অর্থাৎ উষ্ণতা বাড়লে ব্যাপনে যে অণুগুলো অংশগ্রহণ করে সেগুলোর প্রবাহ ক্ষমতা বা গতিশক্তি বেড়ে যায়। আবার কি জান, ব্যাপনে অংশগ্রহণকারী অণুগুলির আকার বা আয়তন যদি ছোট হয় তাহলে ব্যাপন দ্রুত হয়। আর অণুগুলির আয়তন বড় হলে ব্যাপন ধীর লয়ে ঘটে। আর ব্যাপনক্ষম দুটি পদার্থের ঘনত্বের তফাৎ যতবেশি হবে ব্যাপনও তত তাড়াতাড়ি হবে।

তোমরা জান জল সব সময় উঁচু স্থান থেকে নিচুর দিকে যায়। অর্থাৎ এই জলপ্রবাহের মূলে আছে উচ্চতার পার্থক্য। ঠিক তেমনি ব্যাপনক্রিয়া ঘটে ব্যাপন চাপের পার্থক্যের জন্য। ব্যাপন ক্রিয়ায় যে চাপের সৃষ্টি হয় তাকে বলে ব্যাপন চাপ। অণুর ঘনত্ব বাড়লে ব্যাপন চাপ বাড়বে এবং অণুর ঘনত্ব কমলে ব্যাপন চাপ কমবে। আবার সেই ধূপের সুগন্ধের কথায় ফিরে আসা যাক। ধূপের গন্ধযুক্ত গ্যাসের অণুগুলির ঘনত্ব বেশি, তাই ব্যাপন চাপও বেশি। ঘরের বায়ুর ঘনত্ব কম তাই ব্যাপনচাপও কম। তাই ঘরের বায়ুর কম ঘনত্বে 'ব্যাপন চাপের ঘাটতির' ফলে সুগন্ধ গ্যাসের অণুগুলি ঘরের বায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে।

জীবের-জীবনে ব্যাপনের গুরুত্ব অপরিসীম। উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রত্যেকের শারীরবৃত্তীয় কার্যের সঙ্গে ব্যাপন জড়িত। মানুষের কথাই ধর। আমরা যে খাদ্য খাই তা ক্ষুদ্রান্ত্রে সরল খাদ্যে রূপান্তরিত হয়। এই সরলখাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে অবস্থিত ভিলাই দ্বারা শোষিত হয়। ভিলাই-এর আবরণী কোষের কোষ-রসের ঘনত্ব সরলখাদ্যের ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি। তাই সরলখাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রের নালী থেকে ভিলাইএ প্রবেশ করে। ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফুসফুসের বায়ুস্থলী থেকে অক্সিজেন রক্ত জালকের রক্তে প্রবেশ করে। কোষে উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রথমে আসে কলারসে। পরে কলারস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তজালকের শিরা অংশে আসে। তাহলে দেখ, ব্যাপন প্রক্রিয়া মানুষের বেশ কয়েকটি শারীরবৃত্তীয় কাজে লাগে। মানুষ ছাড়া আরো কত প্রাণীকে ব্যাপন শারীরবৃত্তীয় কাজে সাহায্য করে। অ্যামিবা, প্যারামোসিয়াম, হাইড্রা প্রভৃতি প্রাণীর দেহে উৎপন্ন কার্বনডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং অ্যামোনিয়া (NH_3) গ্যাস কোষপর্দার মাধ্যমে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় দেহের বাইরে মুক্ত করে। উদ্ভিদের জীবনেও ব্যাপনের গুরুত্ব কম নয়। সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করার জন্য যখন মাটি থেকে জল ও জলে দ্রবীভূত ধাতব লবণ শোষণ করে, এই শোষণ প্রক্রিয়াও ব্যাপনের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে জীবজগতে ব্যাপন অপরিহার্য।

পাইটা, বর্ধমান

পড়াশোনা

পদার্থ-বিদ্যার কথা

অজয় চক্রবর্তী

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে এবং বলের এককের সংজ্ঞা নির্দেশ করে আমরা দেখেছি যে, কোন বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল বলের মান ঐ বস্তুর ভর এবং ত্বরণের গুণফলের সমান। কাজেই বলের একক

$$= \text{ভরের একক} \times \text{ত্বরণের একক}$$

$$= \text{ভরের একক} \times \frac{\text{দৈর্ঘ্যের একক}}{(\text{সময়ের একক})^2}$$

এককের বিভিন্ন পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য এবং ভরের একক বিভিন্ন। কাজেই বিভিন্ন পদ্ধতিতে বলের এককও বিভিন্ন হবে। তিনটি পদ্ধতির বলের এককের সংজ্ঞা দেবার আগে আমরা কয়েকটি এককের প্রতীক-চিহ্ন নির্দিষ্ট করে নেব। নিচের তালিকায় এককগুলোর নাম এবং তাদের প্রতীকচিহ্ন লেখা হয়েছে।

রাশি	এককের নাম	প্রতীক চিহ্ন
দৈর্ঘ্য	মিটার (metre)	m
	সেণ্টিমিটার (centimetre)	cm
	মিলিমিটার (milimetre)	mm
	ফুট (foot)	ft
ভর	গ্রাম (gram)	g
	কিলোগ্রাম (kilogram)	kg
	পাউণ্ড (pound)	lb
সময়	সেকেণ্ড (second)	s

তোমরা দেখেছ যে, গ্রাম-এর প্রতীক হিসেবে 'gm' এবং সেকেণ্ড-এর প্রতীক হিসেবে 'sec' ব্যবহৃত হয়। আগে এককের প্রতীক চিহ্নাদি লেখার ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক নির্দেশ ছিল না বলে এ ব্যাপারে ছিল নানা মুনির নানা মত। বিজ্ঞানে এরূপ যথেচ্ছ হলে চলে না। তাই, বর্তমানে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট আন্তর্জাতিক প্রথা নির্দিষ্ট হয়েছে। এই প্রথানুসারে গ্রাম-এর প্রতীক 'g' (gm নয়) এবং সেকেণ্ড-এর প্রতীক 's' (sec নয়)। আমরা আমাদের আলোচনায় প্রতীক চিহ্ন লেখার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পদ্ধতিই অনুসরণ করবো।

আমরা দেখেছি যে, বলের একক = ভরের একক × দৈর্ঘ্যের একক / (সময়ের একক)^2। সি. জি. এস. পদ্ধতিতে ভরের একক g, দৈর্ঘ্যের একক cm এবং সময়ের একক s। কাজেই, এ পদ্ধতিতে বলের একক হলো g. cm/s^2। বলের এই এককের নাম ডাইন (dyne)। এক গ্রাম ভর বিশিষ্ট বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে যে বল বস্তুটিকে 1 cm/s^2 ত্বরণ উৎপন্ন করে তাকে '1 ডাইন' বলা হয়। ডাইনের সংজ্ঞা মনে রাখার সুবিধের জন্য নিচের চিত্রটি দেখ।

এফ পি এস. পদ্ধতিতে ভরের একক lb, দৈর্ঘ্যের একক ft এবং সময়ের একক s। কাজেই, এ পদ্ধতিতে বলের একক lb. ft/s^2। বলের এই এককের নাম পাউণ্ডাল (poundal)। এক পাউণ্ড ভরবিশিষ্ট বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে যে-বল বস্তুটিতে 1 ft/s^2 ত্বরণ উৎপন্ন করে তাকে '1 পাউণ্ডাল' বলা হয়। পাউণ্ডালের সংজ্ঞা মনে রাখার সুবিধের জন্য নিচের চিত্রটি দেখ।

এম. কে. এস. পদ্ধতিতে ভরের একক kg, দৈর্ঘ্যের একক m এবং সময়ের একক s। কাজেই, এ পদ্ধতিতে বলের একক kg. m/s^2। বলের এই এককের নাম 'নিউটন'। নিউটনের সংজ্ঞা মনে রাখার জন্য নিচের চিত্রটি দেখ। [ক্রমশঃ]

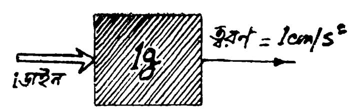

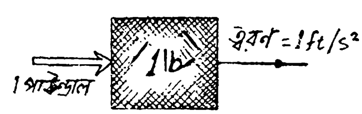

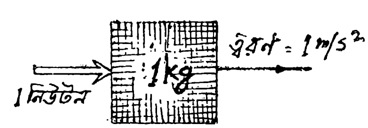

ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞান-সংবাদ

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ধূমকেতু বিষয়ক আলোচনা

গত ৪ই মার্চ কলকাতা বিড়লা মিউজিয়াম অডিটোরিয়ামে দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের পরিচালনায় আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও হ্যালির ধূমকেতু শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

তরুণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারণা ও তার পর্যবেক্ষণ কিভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে করা যায়, এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় ধূমকেতু ও হ্যালি এ বিষয়ে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন পজিশনাল অ্যাস্ট্রনমি সেণ্টারের ডিরেক্টার ডঃ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘ আলোচনায় ইতিহাসে হ্যালির ধূমকেতু সম্পর্কে কুসংস্কার, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে হ্যালি পর্যবেক্ষণ এবং এক নজরে কিভাবে হ্যালির ধূমকেতুর তথ্য সংগ্রহ করা যায়, এ ব্যাপারে তিনি তরুণদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন, এখনও হ্যালিকে খালি চোখে দেখা যাচ্ছে না।

এই আলোচনা সভার উদ্‌ঘাটন করেন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ডঃ দিলীপ সিংহ। প্রফেসর সিংহ হ্যালির ধূমকেতুর গাণিতিক গণনা সম্পর্কে মনোমত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সম্পাদক শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅসীম চক্রবর্তী। আগামী 11ই এপ্রিল থেকে অ্যাসোসিয়েশন তরুণদের আকাশ পর্যবেক্ষণের একটি বিশেষ প্রজেক্ট নিয়েছেন।

এই আলোচনা সভায় 170 ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়।

মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদের সাফল্য

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত 'রাজ্য বিজ্ঞান প্রদর্শনী'-তে ক্লাব পর্যায়ে মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদের সভ্য সৈয়দ রিয়াজ কাদির ও পার্থ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'স্বয়ংক্রিয় লেভেল ক্রশিং গেট' অন্যতম পুরস্কার প্রাপক বলে বিজয় গৌরব অর্জন করেছেন।

গত 10.2.86 তারিখ থেকে কান্দীতে অনুষ্ঠিত হল বিজ্ঞান মডেল প্রতিযোগিতা (জেলা স্তরের)। এই প্রতিযোগিতায় মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদের সৈয়দ রিয়াজ কাদির (স্বয়ংক্রিয় লেভেল ক্রশিং গেট) এবং সুবীর ঘোষ (ভূপাল: গ্যাস লিকেজ অ্যালার্ম) যথাক্রমে প্রথম ও চতুর্থ স্থান দখল করে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চলীয় বিজ্ঞান মডেল প্রতিযোগিতায় যোগদান করার জন্য নির্বাচিত হয়।

'জ্ঞান বিচিত্রা'-র আবেদন

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার স্বার্থে এবং একটি সাহসী ও সুন্দর প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলার জন্যে আমরা একটি নিজস্ব মুদ্রণালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছি। এই কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই বিজ্ঞানীদের কাছে তিনটি প্রস্তাব নিবেদিত হল:

— এক॥ যাঁর যতটুকু সামর্থ্য এককালীন সাহায্য হিসেবে দান করুন।

— দুই॥ যিনি যতটুকু পারেন তা ঋণ হিসেবে দিন —যা কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ করে দেওয়া হবে।

— তিন॥ এককালীন একশ টাকা দিয়ে তিন বছরের অথবা ছ'ত্রিশ টাকা দিয়ে এক বছরের গ্রাহক হয়ে পত্রিকার উন্নয়নে সাহায্য করুন।

দেবানন্দ দাম, সম্পাদক—জ্ঞান বিচিত্রা, 10, জগন্নাথ বাড়ি রোড, আগরতলা 799 00, পশ্চিম ত্রিপুরা।

কাটোয়া কলেজ শরীর বিজ্ঞানের আলোচনা চক্র

কাটোয়া কলেজের শরীর বিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত গত 13 ও 14 জানুয়ারি দু'দিন ব্যাপী একটি আলোচনা চক্রের উদ্‌বোধন করলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শঙ্করী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একুশজন বিজ্ঞানবিদ এ আলোচনাচক্রে অংশ গ্রহণ করেন এবং ডায়াবেটিকে পরিকল্পিত খাদ্য, স্পোর্টস্ মেডিসিনে পুষ্টি, পুষ্টি বিষয়ক সাম্প্রতিক গবেষণা কীটের হরমোন সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ, পুরুষ সাঁতারুদের শারীরিক তৎপরতায় ভিটামিন-সি'র পরিপূরকতা, মানুষের উন্নয়নে প্রাণিজ পুষ্টি, মানুষ ও পুষ্টি, জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং এবং হরমোন ও পুষ্টি বিষয়ক গবেষণায় তার প্রয়োগ ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁরা মৌলিক বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। ছাত্র ছাত্রী ছাড়া কাটোয়া মহকুমার বহু ডাক্তার, শিক্ষক অধ্যাপক ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ এ আলোচনা চক্রে উপস্থিত ছিলেন।

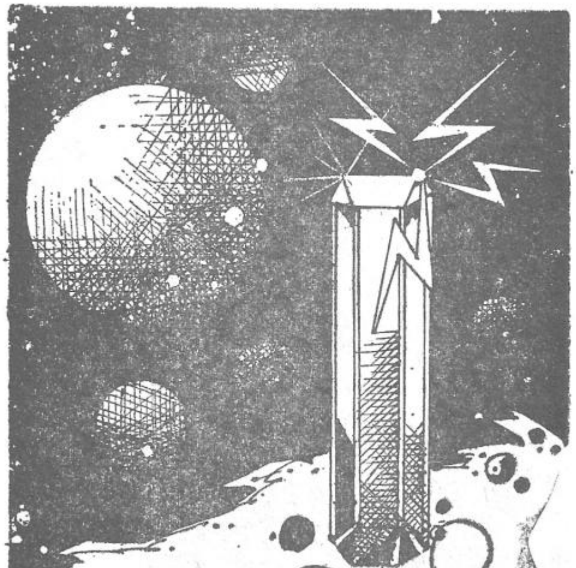

অমল থীয়ার রহস্য

নিরঞ্জন সিংহ

[এগার]

(বাজনা রহস্য)

এখন কি হবে কাকাবাবু ?' সমীরের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল সবাই। চন্দ্রনাথবাবু রবার্টের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে বললেন, 'এসো আর একবার ভিতরে ঢুকে ভাল করে খুঁজে দেখি। পাতালপুরী থেকে বেরুবার মাত্র একটিই রাস্তা থাকবে তা হতে পারে না, নিশ্চয় অন্য দিকে আরো রাস্তা আছে। অন্ততঃ ইমারজেন্সী রাস্তাটা তো থাকবেই।' বলে আবার সুড়ঙ্গের মধ্যে পা বাড়ালেন উনি। ও'র কথায় এতক্ষণে রবার্টরা যেন সাহস ফিরে পেল।

সুড়ঙ্গ পার হয়ে সবাই আবার পাতালপুরীর মধ্যে গিয়ে পড়ল। এবার চন্দ্রনাথবাবু আগে আগে চলেছেন। ওরা পিছনে পিছনে। চন্দ্রনাথবাবু একটু দ্রুতপায়ে সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে চললেন। সবাই নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। যে কোন মুহূর্তে অমলথীয়াবাসীদের মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু অমলথীয়াবাসীদের ভয় করলে তো এখন চলবে না। যা হওয়ার তা হবে। এখন এখান থেকে বেরুবার পথ খুঁজে বের করাই ওদের প্রথম কাজ।

রাস্তার শেষ প্রান্তে এসে সবাই থমকে দাঁড়ালো। রাস্তা বন্ধ। এয়ার লকের হ্যাচের মত একটা হ্যাচ বসানো রাস্তার শেষে। রবার্টই ছুটে গিয়ে দরজা ধরে টানল। কিন্তু দরজা খুলল না। রবার্ট উত্তেজিতভাবে দমাদম করেকটা লাথি লাগালো দরজার উপর। কিন্তু তাতেও দরজা খুলল না। চন্দ্রনাথবাবু এগিয়ে গিয়ে টর্চের আলো ফেলে ভাল করে দরজাটা পরীক্ষা করতে লাগলেন। দরজার পাশে পাথরের উপর একটা ছোট্ট বাটন চোখে পড়ল ও'র। বাটনে চাপ দিলেন কিন্তু তাতেও দরজা খুলল না। এবার চন্দ্রকান্তবাবুও যেন খানিকটা হতাশ হয়ে পড়লেন। তাহলে এখান থেকে জীবন্ত বেরুবার কি কোন পথ নেই ? তিলে তিলে এখানেই মৃত্যুবরণ করতে হবে এই অন্ধকার গুহায় ? অমলথীয়াবাসীরাই বা সামনে আসছে না কেন ? কি করতে চায় ওরা ? বিড়াল যেমন ইঁদুরকে নিজের আয়ত্বের মধ্যে রেখে নড়াচড়া করতে দেয়, অমলথীয়াবাসীরা কি ওদের সেইরকমভাবে নড়াচড়া করতে দিচ্ছে ? যখনি ইচ্ছে হবে তক্ষুনি বাড়িয়ে দেবে ওদের কালো থাবা, যার অপর নাম মৃত্যু।

চন্দ্রনাথবাবুকে চুপচাপ থাকতে দেখে সমীররাও মনে মনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ক্লান্তি ও হতাশায় ওরা দরজার সামনে বসে পড়েছিল একে একে।

চন্দ্রনাথবাবু সহজ হবার চেষ্টা করলেন। দরজার বাটনটা ভাল করে পরীক্ষা করলেন তিনি তারপর সাদিককে বললেন, 'সাদিক তুমি বাটনটা চেপে দাঁড়িয়ে থাকোতো।'

কিন্তু আঙ্কল ওটায় চাপ দিয়ে তো কোন লাভ হল না, দরজা খুলল না,' বলল সাদিক।

'আমার মনে হচ্ছে দরজাটা বিদ্যুতের সাহায্যে খোলা-পাড়া করা হয়। এই বাটনটা সুইচ ছাড়া কিছু নয়। আপাততঃ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ বলে দরজাটা খুলছে না। তুমি বাটনটা টিপে রাখো! বিদ্যুৎ সরবরাহ এলে আমার কথার যাচাই হয়ে যাবে। ভাগ্য ভাল হলে দরজা খুলবে। এ চান্স নেওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই।' থামলেন চন্দ্রনাথবাবু।

সাদিক উঠে বাটনটা চেপে দরজার পাশে দাঁড়াল। সময় কাটতে লাগল। অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। কতক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করতে হবে কে জানে ? এক মিনিট সময়কে মনে হচ্ছে যেন এক ঘণ্টা। ভিতরে ভিতরে সবাই যেন ছটফট করছে ; কিন্তু কিছুই করার নেই। অমলথীয়াবাসীরা হঠাৎ যদি এখন আক্রমণ করে বসে তাহলে কী যে ঘটবে তা ভাবতেও ওরা শিউরে উঠছিল।

অবশেষে একসময় ওদের চমকে দিয়ে ওদের ইয়ার-ফোণে ভেসে এল জলতরঙ্গের বাজনা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আলোর

খেলা, এবং আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। খুব তাড়াতাড়ি ওরা হুড়োহুড়ি করে দরজা পেরিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সামনে একটা ছোট্ট সিঁড়ি বেয়ে ওরা সোজা এসে উঠল অমলথীয়ার বুকে।

'মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এবার স্পষ্ট হয়ে উঠছে।' বললেন চন্দ্রনাথবাবু।

'কি ব্যাপার আঙ্কল ?' সাদিক প্রশ্ন করল।

'মনে হচ্ছে অমলথীয়াবাসীদের আক্রমণের ভয় আর নেই।' জবাব দিলেন চন্দ্রনাথবাবু।

'কেন ? প্রশ্ন করল রবার্ট।

'কারণ, বর্তমানে এখানে আমরা ছাড়া আর কোন জীবিত প্রাণী আছে বলে মনে হয় না।'

ওরা সবাই অবাক হয়ে চন্দ্রনাথবাবুর মুখের দিকে তাকাল। ওদের মুখের ভাব লক্ষ করে চন্দ্রনাথবাবু একটু হেসে বললেন 'আমার কথায় খুব অবাক হয়ে গেছ তাই না ? কিন্তু অবাক হবার কিছু নেই। সমস্ত ব্যাপার বিশ্লেষণ করে আমার মনে হচ্ছে অমলথীয়ায় একদল বুদ্ধিমান জীব একটা আস্তানা তৈরি করে বসবাস করত ; কিন্তু যে কোন কারণেই হোক বহুদিন আগেই তারা অমলথীয়া ছেড়ে চলে গেছে। তার প্রমাণ, প্রথম যে সুড়ঙ্গ দিয়ে আমরা এই পাতালপুরীতে প্রবেশ করেছিলাম সেই সুড়ঙ্গের মুখেও দরজা ছিল। কালক্রমে সেই দরজা ভেঙে গেছে এবং সিঁড়িটাও মাটির নিচে এসে গেছে। কিন্তু এদিকের দরজাটা এখনো আস্ত আছে। এই দরজাগুলো হয়তো বাতাস নিরোধক হ্যাচের মত ব্যবহার করা হত, যাতে পাতালপুরীর মধ্যে কৃত্রিম আবহাওয়া বজায় থাকে। চাঁদের মাটির নিচে আমরা যে আস্তানা তৈরি করেছি সেখানে কৃত্রিম আবহাওয়া সৃষ্টি করা হচ্ছে, যাতে মানুষ স্বাভাবিকভাবে বাস করতে পারে।' থামলেন চন্দ্রনাথবাবু। 'তা না হয় হ'ল, কিন্তু আঙ্কল তারা চলে গেল কেন ?' হতাশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল রবার্ট।

চন্দ্রনাথবাবু একটু হেসে বললেন, তাতো বলতে পারব না।'

'তারা কোথা থেকে এসেছিল আঙ্কল ?' প্রশ্ন করল সাদিক।

'তাও বলা সম্ভব নয়।' জবাব দিলেন চন্দ্রনাথবাবু।

'মহাবিশ্বের বুদ্ধিমান জীব রহস্যই থেকে গেল।' বলল সমীর।

'রহস্য থাকলেও মহাবিশ্বের বুদ্ধিমান জীবদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আর কোন রহস্যই রইল না। অমলথীয়ার এই পাতালপুরী এক জ্বলন্ত প্রমাণ।' বলল সাদিক।

'যাক, চলো এখন তাড়াতাড়ি 'উল্কা'য় ফিরে যাওয়া যাক। মনে রাখবে এখন থেকে খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে।' বললেন চন্দ্রনাথবাবু।

সবাই পাহাড় থেকে নিচে নামল। নেমেই এক অদ্ভুত দৃশ্যের মুখোমুখি হল ওরা। সামনের সমতল জায়গায় পোতা রয়েছে সরু সরু স্ফটিকের লাঠি। লাঠিগুলো তিন ফুটের মত উঁচু। খুব কাছাকাছি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই যেন ওগুলো কে বসানো হয়েছে। ওই অদ্ভুত লাঠিগুলোর দিকে ওরা এগিয়ে চলল দারুণ কৌতূহল নিয়ে। ঠিক সেই সময় ছুটে এলো অমলথীয়ার রঙীন ধুলোর ঝড়। সবাই তাড়াতাড়ি মাটিতে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ওদের ইয়ার-ফোনে ভেসে এলো জল তরঙ্গের মিষ্টি কিন্তু এলোমেলো বাজনার শব্দ। মুখ তুলতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল ওদের। স্ফটিকের লাঠিগুলোর মাথা নুয়ে একে অন্যের গায়ে আঘাত করছে আর প্রত্যেকটা লাঠির মাথায় জ্বলে উঠছে অদ্ভুত নীল আলো। মনে হচ্ছে যেন বিদ্যুতের স্পার্ক। কয়েক মুহূর্তের বেশি ব্যাপারটা স্থায়ী হ'ল না।

রবার্ট লাফিয়ে উঠে বলল, 'আঙ্কল, এই লাঠির মাথা ঠোকাঠুকিতেই জলতরঙ্গের বাজনার শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে বলে আমার মনে হচ্ছে।'

'তুমি ঠিকই বলেছো রবার্ট। শুধু তাই নয়, আমার মনে হচ্ছে এইগুলোই হচ্ছে অমলথীয়াবাসীদের জেনারেটিং স্টেশন। ওই রঙীন ধুলোর ঝড়ের সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন যোগাযোগ আছে। আগেই বলেছি এই ঝড় হাওয়ার ঝড় নয়, এ হচ্ছে চৌম্বক ঝড় এই চৌম্বক ঝড়কে কাজে লাগিয়ে কোন বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অমলথীয়াবাসীরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করত। চৌম্বক ঝড়ের ধাক্কায় ওই স্ফটিকের মত দেখতে লাঠিগুলো একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা মারছে—এইভাবে হয়তো বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। ঠোকাঠুকির শব্দগুলো নিশ্চয় বেতার তরঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে তা না হলে ওই জলতরঙ্গের শব্দ কিছুতেই আমাদের ইয়ার-ফোনে পৌঁছুতো না।'

'কিন্তু আঙ্কল জেনারেটার ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে কি করে ?' প্রশ্ন করল সাদিক।

'জেনারেটার ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন অসম্ভব নয়। তবে এরা ঠিক কি পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল তা ব্যাখ্যা করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'কিন্তু কাকাবাবু তাই যদি হয় তাহলে ভিতরে অন্ধকার কেন ?' সমীর প্রশ্ন করল।

'তার প্রধান কারণ যে সমস্ত স্টোরেজ ব্যাটারিতে এই বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখা হত সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। তাই যখন চৌম্বক ঝড় উঠছে শুধু সেই সময়টুকুতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে এবং পাতালপুরীর আলো জ্বলে উঠছে, আর অন্য সময়ে অন্ধকার।' বললেন চন্দ্রনাথবাবু।

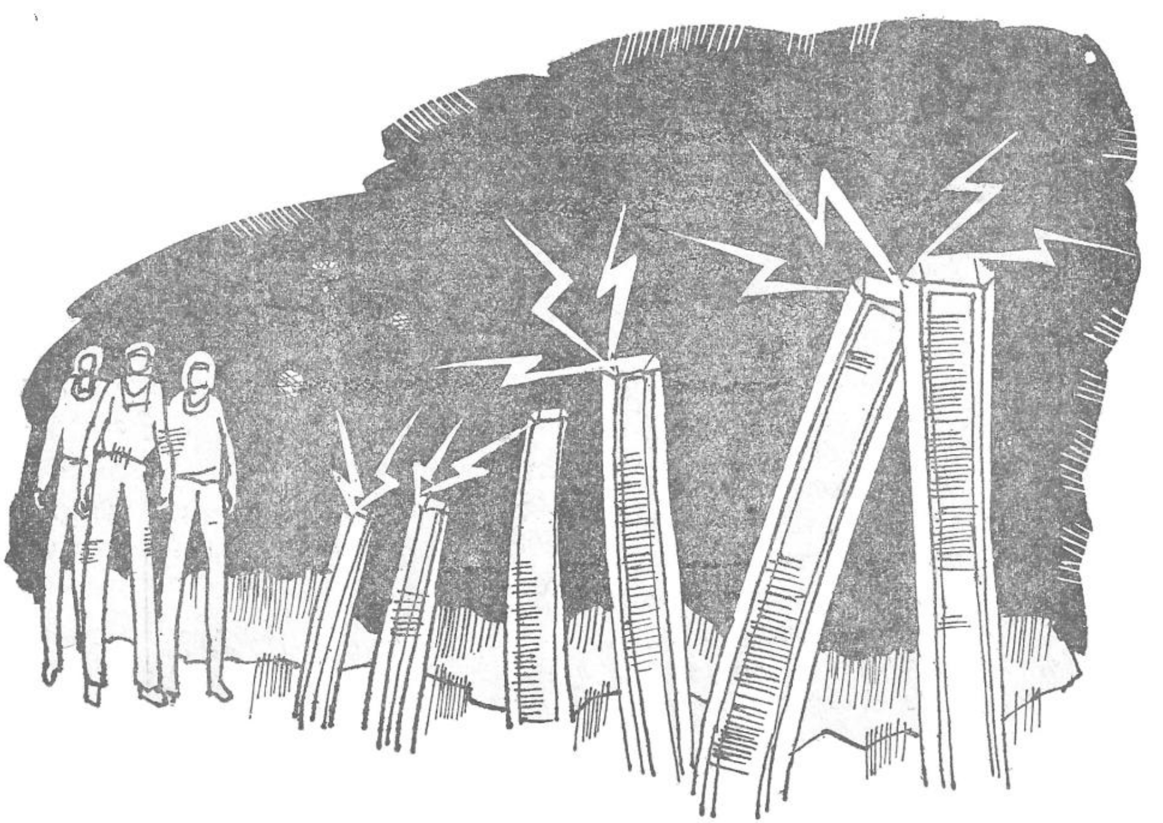

চৌম্বক ঝড়ের ধাক্কায় স্ফটিকের মতো দেখতে লাঠিগুলো একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা মারছে—এইভাবে হয়তো বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে।

'এতক্ষণে পাতালপুরীর অন্ধকারের কারণ বোঝা গেল।' বলল সাদিক।

'কিন্তু আঙ্কল, আপনার কি মনে হয় যে এখানকার পাহাড় সোনা আর প্লাটিনামের?' জানতে চাইল রবার্ট।

'সেকথা এক্ষুনি বলা মুশকিল তবে, সোনা, প্ল্যাটিনাম না হলেও ওগুলোর মধ্যে যদি কোন স্থায়ী মৌলিক পদার্থের খোঁজ পাওয়া যায় তাহলে বিজ্ঞানীদের কাছে তার দাম অনেক।'

'আঙ্কল, দেখা যাচ্ছে আপনার ধারণাই ঠিক। অমলথীয়াবাসীরা বহুকাল আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে, নয়তো এখান থেকে নিজেদের গ্রহে ফিরে গেছে। আঙ্কল, তাই যদি হয় তাহলে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও ফুয়েল সেল কারা চুরি করল, কারা ট্রান্সমিটারটাকে ধ্বংস করল? নিশ্চয় মিঃ চার্লস ও মিঃ ব্রাড্।' বলে উঠল সাদিক।

কথাটা এতক্ষণে কেউ খেয়াল করে নি। সাদিকের কথায় রবার্ট বলে উঠলো, 'তুই ঠিকই বলেছিস। একাজ ও'রা ছাড়া আর কে করবে? আঙ্কল, নিটো 'উল্কা'য় একা রয়েছে। মিঃ চার্লস নিশ্চয় ওর ক্ষতি করার চেষ্টা করবেন। আমাদের এক্ষুনি উল্কায় ফেরা দরকার।'

'ঠিক বলেছো রবার্ট, আমাদের আর এক মুহূর্ত নষ্ট করা উচিৎ নয়। চলো যত তাড়াতাড়ি পারা যায় উল্কায় ফিরে যাওয়া যাক।' বললেন চন্দ্রনাথবাবু।

খুব সাবধানে সবাই 'উল্কা'য় উঠল। রবার্ট একটানে প্রথম দরজাটা খুলে ফেলল। দ্বিতীয় দরজা খুললে তবে ভিতরে ঢোকা যায়। রবার্ট দরজা খুলে প্রায় লাফিয়ে ভিতরে ঢুকল। তারপর মাথার হেলমেটটা খুলে চিৎকার করে ডাকল 'নিটো।'

রবার্টের ডাকে নিটোভস্কী সাড়া দিল কন্ট্রোলরুম থেকে, 'আমি এখানে।'

নিটোভস্কীর জবাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা কন্ট্রোল-রুমে ছুটে গেল। চন্দ্রনাথবাবুও এগিয়ে গেলেন। দেখা গেল নিটোভস্কী হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কন্ট্রোল রুমের মেঝেয় পড়ে রয়েছে।

'এ অবস্থা কি করে হ'ল?' রবার্ট প্রশ্ন করল।

মিঃ চার্লস উল্কায় ফিরে এসে আচমকা আমাকে আক্রমণ করে কব্জা করে ফেলেন। তারপর বেঁধে রেখে 'উল্কা থেকে নেমে গেছেন।' বলল নিটোভস্কী।

চন্দ্রনাথবাবু এগিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি নিটোভস্কীকে

মেঝে থেকে তুলে ধরে উদ্বিগ্নস্বরে প্রশ্ন করল, 'তোর লাগে নিতো ?'

'না।' জবাব দিল নিটোভস্কী।

'মিঃ ব্রাড়ু কোথায় ?' জিজ্ঞাসা করলেন চন্দ্রনাথবাবু।

'ও'র কোন সাড়াশব্দ পাই নি। মনে হচ্ছে ঘুমুচ্ছেন উনি।' বলল নিটোভস্কী।

'মিঃ চার্লসকে ধরতে হবে। ও'র সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেছে।' বলে উঠল রবার্ট।

কিন্তু তোরা সেই অন্ধকার পাতালপুরী থেকে বের হলি কি করে ?' প্রশ্ন করল নিটোভস্কী।

রবার্ট একটু অবাক হয়ে বলল, 'আমরা পাতালপুরীতে আটকে পড়েছিলাম সে কথা তুই জানলি কি করে ?'

'মিঃ চার্লসই সেকথা বলেছেন। কিভাবে সবাইকে সেই পাতালপুরীর মধ্যে ফেলে রেখে দড়ি নিয়ে পালিয়ে এসেছেন তা সবিস্তারে আমাকে জানিয়েছেন। আমাকেও যথেষ্ট ভয় দেখিয়ে নিচে নেমে গেছেন। বলে গেছেন, ফিরে এসে 'উল্কা' নিয়ে আয়োতে রওনা হবেন। যাওয়ার আগে আমাকে 'উল্কা' থেকে নামিয়ে দেবেন।'

'নামাচ্ছি।' বলে রবার্ট দাঁত কিড়মিড় করে উঠল।

'তোরা কি করে বেরুলি তা বললি না।' নিটোভস্কী আবার জানতে চাইল।

সাদিক অল্প কথায় ব্যাপারটা নিটোভস্কীকে বুঝিয়ে বলল। সব শুনে নিটোভস্কী বলল, 'ভগবানকে ধন্যবাদ। ভাগ্যিস পাতালপুরী থেকে বেরুবার আর একটা রাস্তা ছিল। না হলে কি যে ঘটত তা ভাবতেও আমার ভয় করছে।'

'শত্রু আমাদের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল; কিন্তু কথাটা জানতে আমাদের অনেক সময় লাগল।' উত্তেজিতভাবে বলল রবার্ট।

'কিন্তু আমাদের এই অমলথীয়ার বুকে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে আয়োতে গিয়ে ও'রা কি কৈফিয়ৎ দিতেন।' বলল সাদিক।

'কৈফিয়তের আর কি আছে। বলতেন কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় আমরা সবাই মারা গেছি।' বলল সমীর।

'এত সহজে মিটে যেতো ? আমাদের মৃতদেহগুলোর কোন খোঁজ পড়ত না।' বলল সাদিক।

'হ্যাঁ পড়ত। এবং আর একটা মহাকাশযান এসে হয়তো নামতো অমলথীয়ায় এবং সত্যিসত্যি আমাদের মৃতদেহগুলো আবিষ্কার করত এবং এই কথাই প্রমাণিত হত যে মিঃ চার্লস যা বলেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।' বলল সমীর।

চন্দ্রনাথবাবু ওদের বাধা দিয়ে বললেন, 'আমার মনে হয় এখন সময় নষ্ট না করে মিঃ চার্লসের খোঁজ করা উচিৎ। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে ও'কে ?'

নিটোভস্কী হঠাৎ বলে উঠল, 'আঙ্কল সব শুনে মনে হচ্ছে মিঃ চার্লসকে খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে না।'

'কোথায় ও'কে পাওয়া যাবে বলে তোর মনে হয় ?' প্রশ্ন করল রবার্ট।

'মনে আছে প্রথমদিন মিঃ চার্লস ও মিঃ ব্রাড়ুকে একটা টিলার কাছে দেখা গিয়েছিল। মিঃ চার্লস বলেছিলেন ওখানে একটা গুহা আছে—যেখানে ও'রা বিশ্রাম করেছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিঃ চার্লসকে ওই গুহাতেই পাওয়া যাবে। আর ওখানেই পাওয়া যাবে আমাদের হারানো অস্ত্রশস্ত্র ও ফুয়েল-সেলদুটো।' নিটো-ভস্কী কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় যেন হাঁফাতে লাগল।

[আগামী সংখ্যায় শেষ]

সাধারণ জ্ঞানের আশ্চর্য বই

ইউনেসকো ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত

অমরনাথ রায় প্রণীত

স্টুডেন্টস্ নলেজ গাইড (১ম) VI—VIII	12·00
স্টুডেন্টস্ নলেজ গাইড (২য়) IX—X	12·00

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-9

খুদে বৈজ্ঞানিক
দিলীপ দাস
বুঝলি পুঁটি, মেজকা আজ আমার জন্য একটা জিনিস নিয়ে আসবে বলেছে! তাই তো খেলতে না গিয়ে এখন বসে আছি।
তাই নাকি উইশ্ ইউ গুড্ লাক খুদে।
টুং টাং ডং
ঐ তোর মেজকা এলো বোধহয়!
কিরে তোরা এই গরমে অমন ঠাণ্ডা মেরে আছিস কেন?
বাইরে খুব গরম মেজকা?
গরম! গরম মানে— দে-দে পাখাটা খুলে দে শিগগির। হোল্ বডিটা জ্বলে গেল। উফস্!
হ্যাঁ, দিচ্ছি মেজকা। আগে তোমার এ্যাটাচিটা রেখে আসি।
কি হলো? পাখাটা চালাচ্ছিস না কেন?
এ্যাই যাঃ লোডশেডিং হয়ে গেল!
লোডশেডিং! রাস্কেল, লোডশেডিং কেন?
আমার জিনিস পাওয়া ঘুঁচে গেল!

কি হলো, হাঁ করে দেখছিস কি? যাও—তোমাদের প্রিহিস্টরিক যুগের ফ্যানই আপাতত চালাও।
ওটা কি জিনিস রে পুঁটি?
কি জানি!
আরে বাবা তোদের ঐ ন্যাস্টি তালপাতার পাখারে বাবা! কি জ্বালা, কি গেরো!
ব-বুঝেছি কাকু আনছি!
ইস্, দেখলি পুঁটি। ঠিক তাল বুঝে হুম্ করে লোডশেডিংটা এসে আমার সব কিছু কেমন গুবলেট করে দিল!
মেলা প্যাঁক প্যাঁক না করে আগে চল পাখাটা নিয়ে আসি।
এ আগুন তোর ঐ হাত পাখাতে ঠাণ্ডা হবার নয়। ও দেখলে গরম আরও বেড়ে যাবে।
তাহলে?
ইউরেকা! স্কুল এক্সিবিশনে দেবার জন্য নিজের হাতে একটা বিদ্যুৎ তৈরী করেছি। তবে কিনা—
আরে বাবা বিদ্যুৎ একটা হলেই হলো। সে জলবিদ্যুৎ স্থলবিদ্যুৎ অথবা তোর তৈরী ঐ হাত বিদ্যুৎই হোক।
জ্বালিয়ে মারলে সব! ছাগলগুলো পাখা আনতে কোন যমের দুয়ারে গেলি?
ঐ শোন! তবে চল দেখবি।
এ্যাই দ্যাখ মাল রেডি,। খালি একটু টেস্ট করে নিলেই হবে।
এই তোর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা!

কেমন, ভাল নয়? এবার বাল্বের তারটা এখানে ঠেকালেই
জ্বলেছে, অপূর্ব!
ছাগল, গাধা, ঘোড়া উল্লুক, আর এক মিনিট দেরী হলে সব জ্বালিয়ে দেব! জ্বালিয়ে দেব!
এখন খালি ফ্যানের তারটা এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া। ব্যাস, সব ঠাণ্ডা।
হ্যাঁ সব ঠাণ্ডা একেবারে যেন বরফ।
পাখা কই?
ও পাখা লাগবে না কাকু, কারেন্ট এসে গেছে।
এই যে, হাতে তৈরী।
কারেন্ট এসে গেছে! হাতে তৈরী মানে?
হ্যাঁ, নিজে করেছি। এক বোতল জলে খানিকটা ব্লিচিং পাউডার গুলে, তারপর একটা তামার পাত একটা দস্তার পাত এর ভেতর পাশাপাশি বসিয়ে দিয়েছি, ব্যাস–
কারেন্ট তৈরী।
হুম, তারপর কি হবে?
এখন এই টুনি বাল্বের সঙ্গে তার দিয়ে ধাতব পাত দুটির মধ্যে ঠেকালেই আলো! মানে বিদ্যুৎ তৈরী।
এখন খালি ঐ ফ্যানের তারের সঙ্গে এই তারটা জড়িয়ে দিলেই ব্যাস।

কি ব্যাস?
ঘুরবে।
তোর মাথা?
না পাখা!
তোর মুণ্ডু, হারামজাদা, ছুঁচো, বজ্জাত! সেরা ভেবেছিস কি?
এ কারেন্টে তোর কোন ভূতের শ্রাদ্ধ হবে শুনি?
সব ভেঙে ফেলব—
গুঁড়িয়ে—
আঃ-হ্-
যাঃ ববাবা! মেজকা হঠাৎ অমন চুপসে সোফাতে সেঁদিয়ে গেল কেন বলতো?
আসল কারেন্ট এসেগেছে তাই—
আঃ। আই অ্যাম সরি।
আর একটু হলেই তো সব জিনিস ফিনিস্ হয়ে যাচ্ছিল। এখন চেপে যা, পরে চাইবি।
আমার জিনিস?

বিশেষ রচনা

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান মনস্কতা

অরূপরতন ভট্টাচার্য

এমন একটি ছেলের কথা ধরা যাক যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে জানে না, ঠিকমতো বসতে গেলেই এলিয়ে পড়ে, ঘুম থেকে ভোরবেলা উঠতে খুব কষ্ট, কিম্বা কোনো দিন উঠল খুব সকাল সকাল, ঘুম এসে গেল সন্ধে হতে না হতে। কিম্বা যেদিন ঘুম ভাঙ্গল অনেক দেরিতে, সেদিন শুতে শুতে রাত বারোটা, সেই সঙ্গে পড়াশুনোতেও ঢিলেঢালা ভাব। সময়ের কাজ সময়ে করে না—এই রকম যে ছেলে, যার জীবনে নিয়ম নেই, শৃংখলা নেই। চলাফেরা, পড়াশুনা সময়ের হিসেবে বাঁধা নয়। সমস্ত ব্যাপারটার সঙ্গে সুন্দরের সম্পর্ক কম, সে ছেলে কখনো বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে বড় হয়ে উঠতে পারে কি? না, পারে না।

বিজ্ঞানের জগৎ আজ অনেক বড়। সেখানে অণু-পরমাণুর ইতিবৃত্ত আছে। কুমেরু অভিযান, চাঁদে পাড়ি তার আওতায় আসে। ভূ-পৃষ্ঠের গভীর থেকে অসীম শূন্যলোকে তার চলাফেরা। বিজ্ঞানের যে কোনো বিষয় সম্পর্কে জানার জন্যে লেখাপড়া করে বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। তবে বিষয়ে ব্যুৎপত্তি, সিদ্ধিলাভ এবং বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠা।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনোভাব বা বৈজ্ঞানিক মানসিকতা আর কিছু। কোনো সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথ এই বিজ্ঞান মানসিকতা নিয়ে জন্মেছিলেন। যেমন তাঁর জীবনে কবিত্ব ছিল সহজাত, তেমনি বিজ্ঞান মানসিকতাও। কিন্তু চর্চায়, অভ্যাসে, নিষ্ঠায় তাঁর জীবনে এই মানসিকতার ভূমিকা হয়ে উঠেছিল অসামান্য।

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলাকার লেখাপড়া সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি'তে নানা বিদ্যার আয়োজন-এ আছে, 'ইস্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত। ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লেংটি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধ কাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইত। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং এবং জিমনাস্টিকের মাস্টার আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় ইংরেজি পড়াইবার জন্য অঘোরবাবু আসিতেন। এইরূপে রাত্রি নটার পর ছুটি পাইতাম।

রবিবার সকালে বিষ্ণুর কাছে গান শিখিতে হইত। তা ছাড়া প্রায় মাঝে মাঝে সীতানাথ দত্ত মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন।'

এইরকম নিয়ম, নিষ্ঠা আর শৃংখলার ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কেটেছে। আর যে বিজ্ঞান মানসিকতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন, নিয়ম, নিষ্ঠার ভেতর দিয়ে তা আরও পরিণত হয়ে ওঠে।

শুধু বিজ্ঞান মানসিকতার কথা নয়, সারা জীবনে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের প্রবন্ধও কম লেখেন নি। সে-সব লেখার অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছে বালক পত্রিকায়, সাধনা পত্রিকায়। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে বিজ্ঞানের প্রতি কতটা অনুরাগ থাকলে, একজন কবির, একজন গল্পকারের নিয়মিত বৈজ্ঞানিক সংবাদ পরিবেশন করবার মতো একটা মানসিকতা হতে পারে, এ কথা ভাবলে অবাক না হয়ে উপায় নেই। এই সব লেখায় ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ করা হয়েছে অত্যন্ত সহজ আর সরল ভাষায়, যা আজকের দিনের পাঠককেও পরিতৃপ্ত করবে। রবীন্দ্রনাথ যে বছর ডালহৌসি পাহাড়ে যান দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে, তার পরের বছর তত্ত্ববোধিনীতে পৌষ সংখ্যায় (1874 খ্রীস্টাব্দ, ডিসেম্বর) 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সম্ভবত এই প্রবন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা।

প্রথম জীবনের বিজ্ঞান রচনার মতো শেষ জীবনেও রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানকে ছাড়তে পারেন নি। তিনি লিখলেন 'বিশ্ব পরিচয়'। সে এক অসামান্য বই। মাধুকরী বৃত্তি নিয়ে পাঁচ দরজা থেকে তিনি এর উপাদান সংগ্রহ করলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়ে উঠল এক অনবদ্য সৃষ্টি।

তিনি চেয়েছিলেন, আমাদের ছেলেরা বিজ্ঞান শিখুক, বাঙ্গালী বিজ্ঞানীরা যেখানে যা কাজ করছেন, তাঁদের আবিষ্কারের কথা ছোটদের কাছে তুলে ধরা হোক। তাই 'বিশ্ব পরিচয়'—এ তিনি মেঘনাদ সাহার আবিষ্কার নিয়ে আলোচনা করেছেন। জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন সারা জীবন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার প্রসঙ্গে তিনি নিজে তো কলম ধরেইছেন, তা ছাড়া তাঁকে বরাবর নানাভাবে সাহায্য করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যে সময়ের মানুষ, তখন থেকে বিজ্ঞান আজ অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। কিন্তু আজ যথার্থ বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে বিজ্ঞানচর্চাকে পৃষ্ঠপোষকতা করছেন, এমন মনীষা কোথায়?

130E, কাঁকুলিয়া রোড, কলি-29

টেলিভিশনের বিকাশ

পার্থসারথি রুদ্র

টেলিভিশন কথাটির বাংলা অর্থ হল দূরদর্শন বা দূরেক্ষণ। এমনই এক ইলেকট্রনিক যন্ত্র যার সাহায্যে শত শত কিলোমিটার দূরের কোন ব্যক্তির কণ্ঠস্বরই শুধু আমরা শুনি না, তার ছবিও দেখি। টেলিভিশন প্রচার কেন্দ্র থেকে একই সংগে শব্দ ও ছবিকে প্রেরণ করা হয়। মহাশূন্যের শত শত কিমি দূরে যে সব মহাকাশযান থাকে তার শক্তিশালী মাধ্যম হল এই টেলিভিশন। কিন্তু কি করে এই টেলিভিশনের বিকাশ লাভ হয়েছিল?

টেলিভিশন একদিনে তৈরি হয়নি। এমন কি কোন একক ব্যক্তিরও চেষ্টার ফলশ্রুতি নয় আজকের দিনের টেলিভিশন। আমেরিকার জর্জ কেরী (George Carry) 1871 সালে সর্বপ্রথম টেলিভিশন তৈরির কথা ভাবেন। পরে একে একে আমেরিকার ডব্লু. ই সয়ার (W. E. Sawyer) এবং ফ্রান্সের মরিস লেব লেন (Maurice Lab Lane) 1880 সালে টেলিভিশন তৈরির কথা চিন্তা করেন। এর ভিতর 1873 সালে বিজ্ঞানীরা সেলিনিয়াম (Selenium) নামক এক পদার্থ আবিষ্কার করেন। এই সেলিনিয়াস কিন্তু আলোকশক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। সেলিনিয়াম ব্যবহার করে 1884 সালে জার্মানীর পল নিপকিউ (Paul Nipkew) এক টেলিভিশন তৈরি করেন। কিন্তু এতে অনেক ত্রুটি থেকে যায়।

1897 সালে জার্মানীর কে. এফ. ব্রাউন (K. F. Braun) ক্যাথোড রশ্মির মোক্ষম নল (Cathode ray discharge tube) আবিষ্কার করেন। 1907 সালে বোরিস রোজিং (Boris Rosing) টেলিভিশন তৈরির কাজে ঐ ক্যাথোড রশ্মি নলের ব্যবহারের কথা বলেন। এমনি করে অনেক চেষ্টা চলছে। তারপর শেষ পর্যন্ত 1926 সালের 26শে জানুয়ারী বেয়ার্ড নামক এক ব্যক্তি প্রথম সার্থক টেলিভিশন তৈরি করেন। 1929 ও 1935 সালের প্রথম দিকে ইংল্যান্ডে পরীক্ষামূলকভাবে টেলিভিশন প্রেরণ কার্য শুরু হয়। ধীরে ধীরে টেলিভিশনের অনেক উন্নতি ঘটে। প্রথমে নিয়মিত টেলিভিশন প্রেরণ কার্য শুরু হয় 1936 সালের 2রা নভেম্বর লণ্ডনের Alexzandra Place নামক স্থানে। তখন ইংল্যান্ডে সর্বমোট 100টি টেলিভিশন ছিল। আন্তঃ উপদেশীয় প্রেরণ কার্য শুরু হয় 1962 সালে। আমাদের দেশে 1959 সালের 15ই সেপ্টেম্বর রাজধানী দিল্লিতে এই প্রেরণ কার্য শুরু হয়। 1971 সাল নাগাদ এমন এক অবস্থা আসে যে তখন পৃথিবীর লোকসংখ্যায় প্রতি হাজারে 75টি করে টেলিভিশন সেট ছিল।

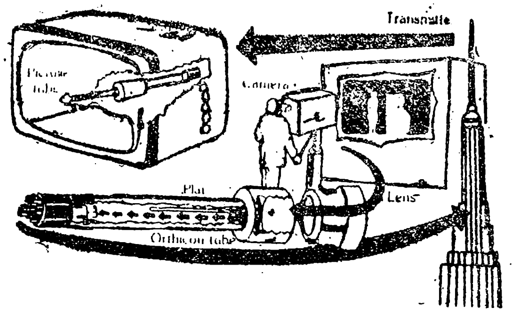

টেলিভিশনের উদ্দেশ্যে যেখান থেকে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় তাকে দূরদর্শন কেন্দ্র (Television Transming Station)। এই কেন্দ্র থেকে শব্দও ছবিকে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গে রূপান্তরিত করে পাঠান হয়। আমাদের এণ্টিনায় ঐ তরঙ্গ এলে টেলিভিশন তাকে পুনরায় শব্দ ও ছবিতে রূপান্তরিত করে। কেমন করে এই ঘটনাটি ঘটে জান?

প্রেরণ কেন্দ্র টেলিভিশন ক্যামেরায় ইলেকট্রন টিউব লাগান থাকে। এই টিউব বা নলকে Orthicon Tube বলে। যে ছবি বা দৃশ্যকে প্রেরণ করা হয় তাকে শক্তিশালী লেন্স দ্বারা অরটিকোন নলের এক আলোক সংবেদনশীল প্লেটে ফেলা হয়। যখন ঐ প্লেটের উপর আলোক রশ্মি পতিত হয় তখন ওর থেকে ইলেকট্রন নির্গত হওয়া শুরু হয়। নির্গত ইলেকট্রন সংখ্যা আলোকের তীব্রতা অনুসারে হয়। একেই বলে 'ভিডিও সিগনাল' বা 'পিকচার সিগনাল'। এই সিগনাল বিস্তারে নিয়ন্ত্রিত করে (Amplitude modulated) এই সিগনাল প্রেরণ করা হয়। এই সময়ে সামঞ্জস্য বিধায়ক বক্তার কণ্ঠস্বর মাইক্রোফোনের সাহায্যে বিদ্যুৎ প্রবাহে রূপান্তরিত করা হয়। একেই বলে অডিও সিগনাল। এই সিগনালকে কম্পাঙ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে প্রেরণ করা হয়। উক্ত ভিডিও এবং অডিও সিগনাল একই সংগে কেন্দ্র থেকে প্রেরণ করা হয়। তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গে ঐ দুই সিগনাল বয়ে চলে। তারপর যখন আমাদের এণ্টিনায় এসে পৌঁছায় তখন বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং সংযুক্ত তারের মাধ্যমে টেলিভিশনে গিয়ে পৌঁছায়। টেলিভিশন তখন ঐ ভিডিও এবং অডিও সিগনালকে পৃথক করে ফেলে। টেলিভিশনের ছবির (Picture Tube) ভিডিও সিগনালকে মূল ছবিতে রূপান্তরিত করে। এমনি করে টেলিভিশনে শব্দ ও ছবি একই সাথে ধরা পড়ে।

কাদম্বিনী টি এস্টেট, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি

লীলাবতী

হিরণ্ময় রায়

ঘোষা, বিশ্ববরা, অপলা, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির মতো লীলাবতীও প্রাচীন ভারতের একজন বিদুষী ও বুদ্ধিমতী মহিলা হিসাবে আজও আমাদের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তবে ঘোষা, বিশ্ববরা, অপলা, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির আবির্ভাব কাল হলো বৈদিক যুগে, আর লীলাবতীর জন্ম বেদোত্তর যুগের একেবারে শেষদিকে—খ্রীস্টিয় দ্বাদশ শতকে। তিনি শুধু বুদ্ধিমতী ও বিদুষী-ই ছিলেন না, গণিতশাস্ত্রেও ছিল অসাধারণ পারদর্শিতা। গণিতশাস্ত্রে তাঁর সে-পারদর্শিতা আজও কিংবদন্তী হয়ে আছে। তাঁকে বাদ দিয়ে ভারতীয় গণিতের ইতিহাস কিছুতেই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

বৈদিক যুগে ভারতীয় আর্যগণের প্রতিভা ও সাধনায় সেই দূরতম অতীতেই গণিতে হিন্দু-মনীষার যে বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছিল, বেদোত্তর যুগে আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধরাচার্য, মহাবীরাচার্য প্রভৃতির কাল পেরিয়ে এইযুগের একেবারে শেষদিকে—খ্রীস্টিয় দ্বাদশ শতকে—বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্যের প্রতিভা ও সাধনায় তা পূর্ণতা লাভ করেছিল। বস্তুত ভারতে তো বটেই, বিশ্বের গণিতের ইতিহাসেও তাঁর কীর্তির তুলনা মেলা ভার। আরও বড় কথা এই যে গণিতের দুনিয়ায় তিনিই প্রাচীন ভারতের হিন্দু মনীষার শেষ যোগ্য প্রতিনিধি। তাঁর তিরোধানের পর গণিতে তেমন কোনো ভারতীয় মনীষার দীপ্তি আর আমাদের নজর কাড়ে না।

এই বিশ্ববিশ্রুত ভারতীয় গণিতাচার্য ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভাস্করাচার্যেরই কন্যা লীলাবতী। দক্ষিণ ভারতে সহ্যাদ্রির পাদদেশে দেবগিরি রাজ্যের বিদার গ্রামে ছিল লীলাবতীর পৈতৃক বাসস্থান। তাঁর (লীলাবতীর) পিতামহ মহেশ্বরাচার্যও ছিলেন একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও দৈবজ্ঞ।

অতি অল্প বয়সেই লীলাবতীর শিক্ষা শুরু হয়। পিতা ভাস্করাচার্য নিজেই কন্যাকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ছাত্রী হিসাবে লীলাবতীও ছিলেন অত্যন্ত মেধাবিনী। অত্যল্পকালের মধ্যেই তিনি বিদ্যার্জনে সাফল্যলাভ করেন এবং বিদুষী মহিলা হিসাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর লীলাবতীর জীবনের সর্বাধিক কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে। 1150 খ্রীস্টাব্দে ভাস্করাচার্য তাঁর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' রচনায় প্রবৃত্ত হলে লীলাবতী নিজেই এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি রচনা করেন। এবং তাঁরই নাম অনুসারে গ্রন্থের এই খণ্ডটির 'লীলাবতী' নামকরণ করা হয়। পাটীগণিত ও পরিমিতি এই খণ্ডটির আলোচিত বিষয়।

চারিটি খণ্ডে বিধৃত ভাস্করাচার্যের 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়, আর দ্বাদশ শতক শেষ হবার আগেই আরবপণ্ডিতগণের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতমহলেও এই মূল্যবান গ্রন্থখানির খবর পৌঁছে যায়।

এইভাবে জ্ঞানের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেও লীলাবতী জীবনে কিন্তু সুখ ভোগ করতে পারেন নি। অকাল-বৈধব্য কেড়ে নিয়েছিল তাঁর মুখের হাসি, ব্যর্থ করে দিয়েছিল তাঁর নারী-জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে।

কন্যার দুর্ভাগ্য মোচনে পিতা ভাস্করাচার্যের চেষ্টাও তাই ব্যর্থ হয়েছিল। সংসারের সর্বসুখ-বঞ্চিতা কন্যার জন্যে এক মূক বেদনা তিনি মনের গোপন কোণে সারাজীবন বহন করেছিলেন খ্রীস্টের ক্রুশের মতোই।

9/12, ঝিল রোড এস্টেট কোয়ার্টার্স, কলি-2

প্রবাসে ভারতীয় বিজ্ঞানী

ডঃ ভি. এস. মালিক

ডক্টর ভি. এস. মালিক একজন শিল্প-বিজ্ঞানী এবং বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফিলিপ মরিস কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত। ডক্টর মালিকের ভাষায়, "জন্মসূত্রে আমি ভারতীয় এবং একজন জাতিয়তাবাদী"। গ্রাম্য পরিবেশে মানুষ হয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার পর নতুন দিল্লীর I. A. R. I. প্রতিষ্ঠানে তিনি চাকরির সন্ধানে যান কিন্তু সেখানে তিনি স্থান পান নি। বাধ্য হয়ে নিজের পথ নিজেই বেছে নেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান উচ্চতর গবেষণায় উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে এক আমেরিকান মহিলাকে বিয়ে করেন এবং সে দেশেই সপরিবারে থেকে যান। ডক্টর মালিক বলেন, বিদেশে বাস করলেও স্বদেশকে, বিশেষ ক'রে আমার গ্রামকে আমি আজও ভালবাসি। আমি এও মনে করি যে, বিদেশে থেকেও কোন না কোন উপায়ে স্বদেশের সেবা করা যায়। ভারতের স্বার্থহানিকর আমেরিকান নীতির বিরুদ্ধে স্থানীয় ভারতীয়দের একতাবদ্ধ করতে আমি আজও সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছি।"

ডক্টর মালিক বলে চলেন, "যে সব ভারতীয় বিজ্ঞানী বিদেশে বসবাস করছেন, স্বদেশীয় বিজ্ঞানীদের তাচ্ছিল্যের চোখে দেখা তাঁদের উচিত নয়। ভারতে প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর অভাব নেই, তাই সে দেশে বিদেশী বিজ্ঞানীরও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন একটাই আছে। সেটা হলো—ভারতীয় বিজ্ঞানীদের উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা"।

(Science Reporter পত্রিকার সৌজন্যে)

অমরনাথ রায়

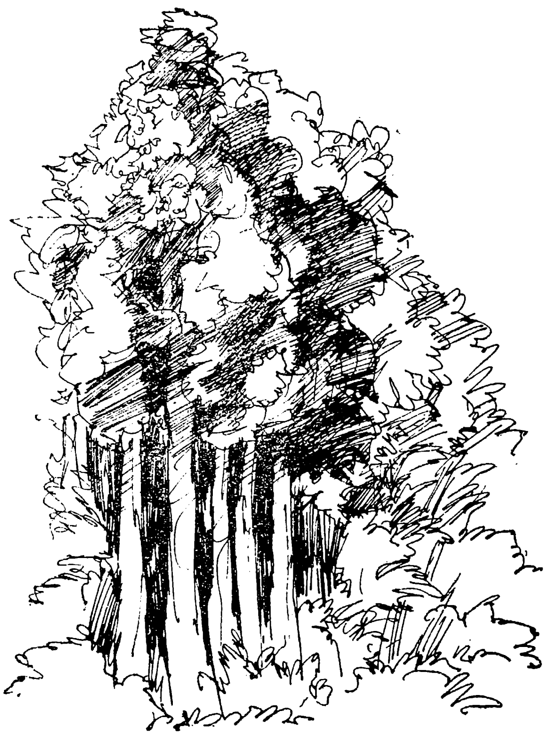

শাল গাছ

সুজিত মুখোপাধ্যায়

কাষ্ঠশিল্পের অন্যতম উপাদান, অবশ্যই মূল্যবান শাল হিমালয়ের পাদদেশ থেকে আরম্ভ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হয়। দেরাদুন, কুমায়ুন, আসাম, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা প্রভৃতি জায়গায় ব্যাপক শাল বনাঞ্চল দেখা যায়। নেপালেও প্রচুর শালবন আছে। এই সমস্ত স্থানের আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকার প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও সাধারণভাবে বালি যুক্ত মাটি, মোটামুটি 120—600 সেমি বৃষ্টিপাত অঞ্চল এবং 22°—30°C তাপমাত্রা সম্পন্ন পরিবেশ শাল উৎপাদনের পক্ষে আদর্শ।

শোরিয়া রোবাস্টা (Shorea robusta) নামে উদ্ভিদ বিজ্ঞানে পরিচিত এই গাছটি ডিপ্টেরো কারপেসী (Diptero Carpaceae) গোত্রভুক্ত দীর্ঘাকার বৃক্ষ পাতা সরল, স্টিপিউল যুক্ত এবং এর পুষ্পবিন্যাস সাইমোজ জাতীয়। ফল আবার সামারয়েড প্রকৃতির। শাল গাছের ছাল মসৃন ও সাদা। কাষ্ঠল অংশটা অনেকটা পিঙ্গল বর্ণের এবং রন্ধ্র যুক্ত।

শালের বীজ থেকেই বংশবিস্তার হয় অর্থাৎ শাল বনাঞ্চল গঠিত হয়। মাটি ভালভাবে নরম এবং উর্বরা করার পর ওতে সারিবন্ধ ভাবে গভীর গর্ত করা হয়। বর্ষার সমাগমে শাল বীজ ঐ স্থানগুলোতে বপন করবার পরে নির্দিষ্ট সময় কাল পর্যন্ত জলসেচন ও আগাছা উৎপাটন করা হয়। বীজ খুব তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হয়। বীজ থেকে অঙ্কুরিত, 2—5 সেমি উচ্চতা সম্পন্ন বৃক্ষকে বীজতলায় রাখবার পর বন সৃষ্টির জায়গায় গর্ত করে লাগান হয়। এই সময় শাল গাছকে রক্ষার জন্য অবলম্বন যুক্ত উদ্ভিদ (Supporting Plants) লাগান হয়। এই উদ্ভিদগুলো অতিরিক্ত তাপ থেকে শালকে রক্ষা করবার জন্য ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করে। মাটিতে যাতে জল জমতে না পারে সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। উদ্ভিদ 30—40 সেমি উচ্চতাসম্পন্ন এবং 6—7 মিটার পরিধিযুক্ত হলে প্রয়োজন মত ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে।

শাল উদ্ভিদটি হার্ডউড গুণসম্পন্ন। খুঁটি, কড়ি, রেলপথের স্লীপার, সেতু নির্মাণ কার্য প্রভৃতিতে শালের প্রচুর ব্যবহার হয়। এছাড়া বাড়ির বিভিন্ন আসবাবপত্র, নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি নির্মাণেও শাল কাঠের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়।

99, মহারাজা নন্দকুমার রোড (নর্থ), কল-35

সবুজ আগন্তুক

জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকর
অনুবাদঃ সৌরেন ভট্টাচার্য

গাড়ির ড্যাশ-বোর্ডের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে টম রহুরিক মনে মনে খানিকটা হিসেব কষে নিল। 'এল পাসো' পেঁছুতে তখনও দীর্ঘ সাঁইত্রিশ মাইল বাকি। 'টেক্সাস একটি বিশাল দেশ'—কথাটা ভূগোলের পাঠ্য বইতে পড়া এক কথা, আর সেই দেশের একধার থেকে অন্যধার পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। যদিও এর আগে টম হাজার মাইল গাড়ি চালিয়েছে, কিন্তু আজ এই সোজা হাইওয়ে ধরে একটানা গাড়ি চালানোর এক-ঘেয়েমী থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একজন সঙ্গীর প্রয়োজনের কথা খুব মনে হচ্ছিল। এই বিশাল, উন্মুক্ত জনবসতিবিরল প্রকৃতির পটভূমিকায় প্রাকৃতিক দৃশ্যের বৈচিত্র্যও খুবই কম।

শেষ একঘণ্টা ধরেই অবসাদ ক্রমশঃ অসহনীয় হয়ে উঠছিল। রাতের অন্ধকার নামার আগেই এল পাসো শহরে পেঁছুতে হবে আর ততক্ষণ পর্যন্ত খিদে আর মাথা গোঁজার আস্তানার ভাবনা দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেঁছুতে পারা যাবে তো! গাড়ি চালানোর দিকে মনটাকে আটকে রাখার ক্ষমতার প্রতি সে ক্রমাগতই সন্দিহান হয়ে উঠছিল। গাড়িটা খানিকক্ষণের জন্য থামিয়ে মিনিট দশেকের জন্য চোখ দুটোকে বিশ্রাম দেবে নাকি? কিন্তু যদি সংগে সংগে ঘুমিয়ে পড়ে আর ঘুম ভাংগতে অনেক দেরী হয়ে যায়, তাহলে কি উপায় হবে!

কিন্তু সেই সিদ্ধান্তই তাকে নিতে হলো খুবই আকস্মিক-ভাবে। সোজা রাস্তায় একটা ছোট্ট বাঁক সে নজর করতে পারেনি। একটা ঝাঁকুনি খাওয়ার পর সে বুঝতে পারল যে রাস্তার ধারের নরম মাটির উপরে এসে দাঁড়িয়েছে। টম সংগে সংগে সিদ্ধান্ত নিল যে কিছুক্ষণের জন্য তার আর গাড়ি চালানো উচিৎ নয়। সে রাস্তার ধারে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে দিল।

পশ্চিমে গোধূলির আকাশ বিচিত্র রঙে রঙীন হয়ে আছে। ছোটবেলায় স্কুলে পড়ার সময় দেখা অনেক পশ্চিমী-সিনেমার কথা টমের মনে এল—নায়ক ঘোড়ার পিঠে বিশাল প্রান্তর পার হয়ে অস্তগামী সূর্যের দিকে চলেছে। পৃথিবীতে এই রকম জায়গা যে সত্যিই থাকতে পারে তখন সে সব বিশ্বাস করা দুরূহ ছিল। আর যে লোকটি কেবলমাত্র এক সপ্তাহ আগে ম্যানহাটানে ভিড়ের মধ্যে গাড়ি চালিয়েছে তার পক্ষে বিশ্বাস করা আরও কঠিন। তার থেকে এটা কল্পনা করা ভাল যে তাকে গ্রহান্তরে নির্বাসিত করা হয়েছে। আর যেহেতু টম বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্পের এক দারুণ ভক্ত, এই রকম একটা অপার্থিব পটভূমিকায় সে তার কল্পনার পাখা মেলে দেয়।

অদ্ভুতদর্শন মহাকাশযান……রহস্যময় ভিনগ্রহবাসী-গণ……অতি আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতি……এই সবের কি বাস্তব অস্তিত্ব আছে? নাকি এই বিশাল মহাবিশ্বে মানুষ নিঃসঙ্গ, একাকী, ঠিক যেমন এই আদিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের সামনে দাঁড়িয়ে টম নিজেকে একা বলে মনে করছে।

হঠাৎ টম অনুধাবন করতে পারে যে সে ঠিক একা

নয়। পশ্চিম দিগন্তে একটা সাদাটে বিন্দু দেখা যাচ্ছে। এটা কি সূর্যাস্তের ম্লান আলোয় শুক্রগ্রহকে দেখা যাচ্ছে? কিন্তু বিন্দুটির আকার ক্রমশই বড় হয়ে উঠছে। সম্বিৎ ফিরে না আসা পর্যন্ত টমের ক্লান্ত মস্তিষ্কে ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত বলে মনে হতে থাকল। জিনিসটা যাই হোক না কেন ওটা ক্রমাগত এগিয়ে আসছে তার দিকে। জিনিসটার আয়তন কতটা বড় হতে পারে?

একদম ফাঁকা পটভূমিকায় কোনো বস্তুর সঠিক আকার নির্ণয় করা যে কতটা কষ্টসাধ্য তা টম জীবনে এই প্রথমবার উপলব্ধি করল। কোনো এরোপ্লেন কি বিপদে পড়ে আপৎকালীন-অবতরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে? কিন্তু জিনিসটাতো নিচের দিকে নেমে আসছে না। তাছাড়া কাছাকাছি আসার পর সেটাকে আর এরোপ্লেনের মতো দেখাচ্ছেও না।

জিনিসটা কাছাকাছি এগিয়ে আসার পর টম একটা অদ্ভুত রকমের শব্দ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। আওয়াজটা ক্রমশই তার কানের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠল। থাকতে না পেরে টম গাড়িতে ঢুকে সব জানালাগুলো বন্ধ করে দিল। আওয়াজের জোর খানিকটা কমল, কিন্তু টম বুঝতে পারল যে আওয়াজের জোরের থেকেও যেটা বেশি তাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছে তা হলো আওয়াজের তীক্ষ্নতা।

আসনে বসে জ্ঞান হারানোর আগে পর্যন্ত তার শেষ সচেতন প্রচেষ্টা ছিল কানে গুঁজে দেওয়ার জন্য খানিকটা তুলোর খোঁজ করা।......

... .

শিবু যখন রাজ্য পরিবহণের বাস থেকে নেমে খামার বাড়ির দিকে রওনা হলো তখন তার সোজা হেঁটে যাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। সাতারায় আজকের দিনটা তারপক্ষে ভালই শুরু হয়েছিল, তার বেশ কয়েকমাস পরে হঠাৎ জুয়াখেলায় তার অনেক জিৎ হলো। দুর্ভাগ্যের কথা সে তার সবটুকু অর্থই অনর্থের মূলে তরল পানীয়ে পরিবর্তিত করে গলাধঃকরণ করে ফেলে।

সেইজন্য যখন বাসের কণ্ডাক্টার তাকে আলতো ধাক্কা দিয়ে গ্রামের স্টপেজে নামিয়ে দেয়, তখন কম হাঁটতে হবে এমন রাস্তাটা ধরার সিদ্ধান্ত নেয়। সে একটা সোজা রাস্তা জানত যা প্রায় কিলোমিটার খানেক কম। এর আগেও সে ওই রাস্তা দিয়ে গেছে, কিন্তু প্রতিবারই দিনের বেলায়। সে যদি প্রকৃতিস্থ থাকত তাহলে এই চাঁদের আলোবিহীন রাত্রে কখনই যেতে চাইত না। কারণ গোটা গ্রামের লোকই বিশ্বাস করত যে রাস্তাটায় ভূত আছে।

কিন্তু আজ আর শিবুর ভয় করছিল না—মদের প্রভাব তাকে সাহস জুগিয়েছিল। খামারে যত তাড়াতাড়ি পেঁছিতে পারে এই একমাত্র লক্ষ্য নিয়ে সে টলতে টলতে পথ দিয়ে এগোতে থাকল।

একটা কিছুতে হোঁচট খেতেই শিবু একটা গালাগালি উচ্চারণ করে। এত রাত্রে এই অন্ধকার ভূতুড়ে রাস্তায় কার আবার আসার দরকার পড়ল।

অবশ্য ব্যাপারটা জানার জন্য শিবুকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। হঠাৎই আলোর ঝলকানি দেখা গেল আর শিবু তাতে দেখতে পেল কিসের বা কার উপরে সে হোঁচট খেয়েছিল। যা দেখল তাতে তার নেশা ঘুচে গেল।

সে একটা লোকের গায়ে হোঁচট খেয়েছিল—লোকটা পুরোপুরি সবুজ রঙের। শিবু অবাক হয়ে দেখল যে লোকটিও কেমন যেন আলোকিত হয়ে উঠে আকাশের দিকে রওনা হলো। সে যখন উপরদিকে তাকিয়ে লোকটা কোথায় যায় লক্ষ্য করছিল তখন সে একটা অদ্ভুত দর্শন মহাকাশযান দেখতে পেল।

শিবু ভয় পেয়ে চীৎকার করতেও ভুলে গেল। মহাকাশ যানটির দিক থেকে একটা অদ্ভুত তীক্ষ্ন শব্দ বেরোতে শুনতে পেল।

এর পরে সে আর কিছু জানে না।

... ...

তার আসল নামটা যে কি তা কেউ জানে না। সকলেই তাকে 'সিসটার মারিয়া' বলে ডাকত। সে সিসিলির একটা আশ্রমের সন্ন্যাসিনী। এই আশ্রমের দরজায় যেদিন তাকে অনাথ হিসেবে ফেলে রেখে গিয়েছিল সেদিন থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে সে মূক এবং বধির। কিন্তু তার সুন্দর হাতের লেখা এবং নিখুঁত ছবি আঁকার ক্ষমতার সাহায্যে অতি সহজেই অন্যের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারত। মারিয়ার মতো লাজুক এবং স্বল্পবাক মেয়ের পক্ষে মাদার সুপিরিয়রের সঙ্গে দেখা করতে চাওয়া একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার। সন্ধ্যায় প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর প্রতিদিনের অভ্যেস মতো মারিয়া সেদিনও বেড়াতে বেরিয়েছিল, কিন্তু বেড়িয়ে ফিরে আসার পর তাকে খুব উত্তেজিত দেখা গেল।

মাদার সুপিরিয়র মারিয়াকে একটা লেখার কাগজ এবং পেনসিল দিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপার কি, মারিয়া ?"

মারিয়ার বলার অনেক কিছু ছিল। সে অনেকগুলি ছবি আঁকল এবং তার সঙ্গে কয়েক লাইন লিখেও দিল।

মাদার সুপিরিয়র কাগজগুলোর দিকে ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাসের সঙ্গে তাকিয়ে থাকলেন। কিন্তু মারিয়া কোনো কথা বানিয়ে বলে শোনা যায়নি আগে। সে যা দেখেছে বলে জানাচ্ছে তার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু সত্য আছে। কিন্তু এ সমস্ত কিছুর মানে কি ?

মারিয়াকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় মাদার হাতের 'ক্রশ'-টাকে আঁকড়ে ধরলেন।

সেই মুহূর্তে ভোজসভা বেশ জমে উঠেছিল। নাসার (N.A.S.A) গডারড্ মহাকাশ উড্ডয়ন কেন্দ্র (গডারড্ স্পেস ফ্লাইট সেণ্টার) এবং মেরীল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকেরা রজার বাক্‌ল্যান্ডকে গডারড্ থেকে বিদায় জানানোর জন্য তাঁর বাসায় একত্রিত হয়েছে। স্কাইল্যাব, স্পেসল্যাব, শাট্‌ল্ প্রভৃতি নাসার মহাকাশ সংক্রান্ত কৃতিত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির সঙ্গে জড়িত নতুন প্রজন্মের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে রজার বাকল্যান্ডকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করা হত। সত্যি কথা বলতে কি কেবলমাত্র একযুগের মধ্যে তিনি এতটা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে, যে কোনো নতুন প্রকল্পের জন্য বৈজ্ঞানিক হিসেবে তাঁর চাহিদাই ছিল সবচেয়ে বেশি।...তাছাড়া রজার ছিলেন সেইসব সীমিত সংখ্যক বৈজ্ঞানিকদের একজন যাঁরা অন্য দায়দায়িত্বের খাতিরে যে কোনো চিত্তাকর্ষক প্রকল্প পরিত্যাগ করার ক্ষমতা রাখতেন। যখনই কোনো নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন রজার আপনমনে বলতেন, "এটাই আমার শেষ বৈজ্ঞানিক প্রকল্প! এরপরে কেবল মাত্র গল্‌ফ্ খেলব আর পালতোলা নৌকা চালাব।" কিন্তু তাঁর সহকর্মীরা সকলেই জানত যে এই প্রতিজ্ঞা কেবলমাত্র সাপ্তাহান্তিক ছুটির দিন পর্যন্তই কার্যকরী থাকবে। তারপরে সোমবার এলেই রজার আবার অফিসের টেবিলে এসে বসবে। "রজার, আমরা নিশ্চিন্তে বাজী ধরতে পারি যে এইবার দুমাস বিশ্রামের পর তোমাকে অপর কাজ করতে দেখতে পাব।" ড্রাই মার্টিনিতে চুমুক দিতে দিতে এক সহকর্মী মন্তব্য করল। বিদায় সংবর্ধনার সংগে ভোজসভা থাকলে তার আপত্তি করার কিছু থাকে না।

"কিন্তু জন, ধর যদি আমার নতুন দায়িত্বভার থেকে একেবারেই আর না ফিরি ? তাহলে তোমার বাজীর কি হবে ?"

—কথাটা জিজ্ঞেস করার সময় রজারের চোখটা বেশ চক্‌চক্ করে উঠল।

"আমাদের ভাগ্যে সেরকম কিছু নেই। আমরা নিশ্চিত যে একটা হাতলাটুর মতো তুমি আবার কাজে ফিরে আসবে। তাছাড়া, মহাকাশযান ভ্রমণ এখনকার দিনে সবচেয়ে নিরাপদ।"

"ঠিক বলেছ ; কেমন যেন অবাক লাগে তাই না ?" আরেকজন বৈজ্ঞানিক অভিমত প্রকাশ করলেন। "মহাকাশ ভ্রমণ বিমানে ভ্রমণের থেকে নিরাপদ এবং বিমানে ভ্রমণ নিজের গাড়িতে করে ঘুরে বেড়ানোর থেকে বেশি নিরাপদ।" "এইভাবে ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিবেচনা করলে দেখা যাবে ঘুরে বেড়ানোর পক্ষে সবথেকে বিপজ্জনক মাধ্যম হলো 'পা'—এবং পায়ে হেঁটে রাস্তা পার হওয়া। যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে বোম্বেতে একটা রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করে দেখতে পার"—সদ্য ভারতবর্ষ থেকে ঘুরে আসা উইলি বোনস্ মন্তব্য করল।

বোম্বের একজন প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী কুমার মাত্রাথে ভাবলেন যে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝান তাঁর দায়িত্ব, "উইলি তুমি একটা আসল জিনিস ভুলে গেছ ! বোম্বেতে রাস্তার জেব্রা ক্রসিং কেবলমাত্র সৌন্দর্য বৃদ্ধির

জন্য তৈরি করা হয়েছে। কোনো গাড়ির চালকই কোনো পথচারীকে রাস্তা পার হতে দেওয়ার জন্য থামবে না। তোমরা সব পশ্চিমের অশিক্ষিত লোকেরা এই সামান্য সত্যটুকুও বুঝতে পার না।"

সকলেই যখন হাসিতে যোগ দিল তখন বোনস লক্ষ্য করে দেখল যে রজার ঠিক আগের মতো হাসি তামাশায় যোগ দিচ্ছে না। উইলি বোনস বৈজ্ঞানিক নন; তিনি রজারের সঙ্গে একসঙ্গে থাকেন বলে এই ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু মানুষের গতিবিধি লক্ষ্য রাখাই তাঁর পেশার অঙ্গ।

ভোজসভা শেষ হলে শেষ অতিথি বিদায় নিতে নিতে প্রায় রাত দুটো বেজে গেল। রজার বাসন ধোওয়ার যন্ত্রর ভেতরে গোটা দশেক এঁটো গ্লাস ঢুকিয়ে রাখল, এবং বোতলগুলোকে যথাস্থানে ঢুকিয়ে রাখল। "দুধ দিয়ে, না কি দুধ ছাড়াই?" উইলিও এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল না। সে এর মধ্যেই কফি তৈরি করে নিয়েছিল কারণ সে ভাল করেই জানত এতসবের পর দুজনেরই কফির দরকার ছিল।

"অনেক ধন্যবাদ, দুধ ছাড়াই দাও।" রজার কৃতজ্ঞ চিত্তে কফির কাপটা হাতে নিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিল। উইলি গিয়ে বসল ঘোরানো চেয়ারে। কালো কফিতে চুমুক দিয়ে সে পেছনের দিকে হেলান দিয়ে বসল এবং অনেকক্ষণ ধরে যে প্রশ্নটা করবে বলে ঠিক করে রেখেছিল সেটা করল।

'আচ্ছা রজার এবার বলো তো, একজন বৈজ্ঞানিকের কেন একজন এফ. বি. আই. এজেন্টের প্রয়োজন হয়।'

'রজার শান্তভাবে কফিতে চুমুক দিতে থাকলেন। ঘরে কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। তাকে মনে হলো কিভাবে উত্তরটা শুরু করবেন তা ঠিক করতে পারছেন না। উইলিও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকল। অবশেষে···'উইলি, তুমি তো বুঝেছ যে আজকে আমি মহাকাশযাত্রার প্রাক্কালে সহকর্মীদের বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে ভোজসভার আয়োজন করেছিলাম।'

'কিন্তু সেটা এমন কিছু নতুন ব্যাপার নয়। বাইরের লোক হয়েও আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে ওরা ব্যাপারটাকে বিদায় সংবর্ধনার থেকেও পুনর্মিলন উৎসব হিসেবেই বেশি দেখছে। তাছাড়া এটাই তো তোমার প্রথম মহাকাশ যাত্রা নয়।'

'সেটা ঠিকই; কিন্তু আমি বেশ নিশ্চিত যে এটাই আমার শেষযাত্রা।' উইলির মুখে হালকা অবিশ্বাসের ছাপ দেখে রজার উঠে দাঁড়াল। তারপর তার টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলে একগাদা কাগজপত্র বের করে উইলির সামনে ফেলল।

উইলি কাগজের গাদাটা খুলে ভেতরে কয়েকটা খবরের কাগজের কাটা অংশ দেখতে পেল—'টেক্সাসের আকাশে উড়ন-চাকি'; 'ভারতীয় কৃষকের সংগে সবুজ মানুষের সাক্ষাৎ'; 'ইতালীর সন্ন্যাসীর নিকট দেবদূতের আগমন ···।'

'আরে, তুমি কবে থেকে এইসব ছাইভস্মে বিশ্বাস করতে শুরু করেছ?' উইলি তার বাল্যবন্ধুর এইসব উড়ন চাকি এবং আধিভৌতিক বিষয়গুলির প্রতি বিতৃষ্ণা সম্পর্কে খুব ভাল করেই জানত।

কিন্তু রজার বিষয়টা হালকাভাবে নেয়নি। "উইলি আমি সচেতন যে এইসব অসমর্থিত খবরের প্রতি আমার যে বিশ্বাস নেই তা তোমার জানা আছে। অতীতে বহুবার এইসব অতিপ্রাকৃত প্রাণীকে দেখা বা মুলাকাৎ হওয়ার খবরগুলিকে খোলাখুলি ভাবে নস্যাৎ করেছি।"

'আমি জানি রজার; কিন্তু······' রজার এতটা উত্তেজিত ছিল যে সে উইলিকে কথা শেষ করতে দিল না। 'উড়ন চাকির এই গুজব শুরু হয় 1947 সাল থেকে, তখন একজন সখের বিমান চালক দাবি করে যে সে চাকতি আকারের একটা জিনিস তার বিমানকে অনুসরণ করতে দেখেছে। এরপরই এইরকম দাবির বন্যা বয়ে যায়।'

রজার এর পর কফির কাপে চুমুক দেওয়ার জন্য একটু থামতেই উইলি কোনো রকমে একটা বাক্য উচ্চারণ করতে পারে, 'আমি জানি সে-সব; কিন্তু সেই দাবিগুলিকে বৈজ্ঞানিকরা অনুসন্ধান করে নাকচ করে দিয়েছিলেন।'

"ঠিক বলেছ। ব্লুবুক প্রকল্প, সাইন প্রকল্প—এই রকম কত বিস্তারিত অনুসন্ধান হয়েছিল। আর তারা কি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিল?'

'কিছু না। 'ইউফো' অর্থাৎ অচেনা উড়ন্ত বস্তু যে ভিনগ্রহ থেকে আসে-এই মূলদাবিকে সমর্থন করে এমন কিছুই প্রমাণিত হয়নি। লোকে কখনও কখনও শুক্র গ্রহকে উড়ন চাকি বলে ভুল করেছে। এমনকি তারা হয়ত মানুষের তৈরি বিমান কিংবা মহাকাশযান দেখেও ভুল করেছে। কারও ঘটেছিল দৃষ্টিবিভ্রম। আবার কেউ বা অস্থির মানসিকতা সম্পন্ন এবং সাক্ষী হিসেবে নির্ভর-যোগ্য নয়···। আর এদের মধ্যে যারা সেইসব তথাকথিত তথ্যগুলিতে কল্পনার রঙ চড়ায় তারা সাক্ষীহিসেবে জঘন্যতম।"

'হ্যাঁ রজার, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে এই বিতর্ক আমি অনুধাবন করেছি এবং এবিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত। এবং তুমি এইসব সংবাদে গুরুত্ব দিচ্ছ দেখে এইকারণেই অবাক হচ্ছি।' এবারে বোনস্ কিছু কথা বলার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, "উদাহরণ স্বরূপ এই টেক্সাসের ঘটনার কথাটাই ধর না কেন? সাক্ষী নিজেই স্বীকার করেছে যে সে ভীষণ পরিশ্রান্ত ছিল এবং মানসিক দিক-

থেকেও সজাগ ছিল না। তার ওই ভারতীয় চাষীটি তো রীতিমত মাতাল ছিল। আর সিস্টার মারিয়ার সাক্ষ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার কোনো পুরোনো প্রমাণ আমার জানা নেই। মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া এবং কম্বোডিয়ার ঘটনার বিবরণগুলোর ক্ষেত্রেও একই বিশ্বাসযোগ্যতার সমস্যা থেকে যাচ্ছে। অবশ্য চোখে যা দেখা যাচ্ছে তার থেকেও বেশি কিছু আছে, বিশেষ করে তুমি যখন এসব আমাকে দেখাচ্ছ।"

'উইলি তুমি সেদিক থেকে ঠিকই বলেছ। এইসব বিবরণ কিংবা সাক্ষীরা কিছুই মনে দৃঢ়ভাবে দাগ কাটে না। তারা আইনের জেরার সামনে ধোপে টিকবে না। কিন্তু এসবের উপরেও আরো কিছু আছে।'

রজার আবার উঠে তাঁর টেবিলের কাছে গিয়ে তালা লাগানো দেরাজ খুলে 'অত্যন্ত গোপনীয়' চিহ্ন করা একটি খাম বের করলেন। তিনি সেটা খুলে একটি চিত্র বের করে আনলেন।

উইলি প্রথমে খালি চোখে, এবং তারপরে পকেট থেকে আতসকাঁচ বের করে তার ভেতর দিয়ে ছবিটা পর্যবেক্ষণ করে দেখল। রজার খানিকটা আশামিশ্রিত কৌতুকের সঙ্গে সব লক্ষ্য করছিলেন।

আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল। উইলি শিস্ দিয়ে উঠল। রজার বলতে থাকলেন, 'তুমি আতসকাঁচের ভেতর দিয়ে যা দেখছ তা আমরা যন্ত্রগণক-চালিত হাজার গুণ বেশি শক্তিসম্পন্ন বিবর্ধক দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। অবশ্য তুমি ছবিটার মূল ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছ।'

'এই ছবিটা তুমি কোথায় পেয়েছ?'

'এই ছবিটা আমার সহকর্মী ডিকক্রুস্ট একটি মহাকাশ অভিযানে থাকার সময় ছবিটা তুলে আমাকে পাঠিয়েছে। খুব সম্ভবতঃ সেটাই তার জীবনের শেষ কাজ, কারণ—আমরা তাঁর এবং তাঁর মহাকাশযানের কোনো খোঁজ এখনও পর্যন্ত পাইনি।'

'দাঁড়াও! দাঁড়াও! একটা মহাকাশযান হারিয়ে যাবে আর কেউ তা জানতে পারবে না এতো হতে পারে না। এরকম কোনো ঘটনার কথা পড়েছি বলে তো মনে হচ্ছে না' —উইলি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছে। রজার মাথা নেড়ে বক্তব্যটা অনুমোদন করলেন।

'এই সমস্ত গোপন বিষয় তোমাকে জানানো আমার উচিৎ নয়। কিন্তু এইটা নিয়ে আমরা চারটে মহাকাশযান হারালাম। প্রথমটা ছিল সামরিক বাহিনীর, দ্বিতীয়টি সি. আই. এ-র আর তৃতীয়টিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ক্রুস্টকে পাঠানো হয়েছিল তৃতীয়টি, কেন নিরুদ্দেশ হলো তার কারণ অনুসন্ধান করতে। অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই টি. ভি. চিত্র পাঠানোর নির্দেশ ছিল তাঁর উপর। যেক্ষেত্রে পর্যবেক্ষক ছবি পাঠাতে অক্ষম হয়ে পড়ত সেক্ষেত্রে একটা আপৎকালীন বোতাম টিপলেই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ছবি পাঠানোর ব্যবস্থা মহাকাশযানে করা ছিল……।

"এবং ঠিক তাই ঘটেছে এক্ষেত্রে। নিজের স্বাধীন-ইচ্ছামত কাজ করার জন্য ক্রুস্ট মাত্র পাঁচ মিনিট সময় হাতে পেয়েছিল। সে একটা মৌখিক বার্তা পাঠানোর সময় এই বোতামটাও টিপে দিয়েছিল। তার ফলে এই রকম একশটা ছবি পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল।'

'আর মৌখিক বার্তার কি হলো? ক্রুস্ট কি বলেছিল?' উইলি উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস করল।

'উইলি তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, একজন বৈজ্ঞানিক এফ. বি. আই-এর তদন্তকারীর কাছ থেকে কি আশা করে এখন তার উত্তর দেব।'

ক্রুস্টের শেষ এবং একমাত্র শব্দ ছিল: 'একটা মহাকাশযান.......ভেতর থেকে সবুজ মানুষেরা বেরিয়ে আসছে··· কিন্তু······।'

উইলি তার পাইপ ধরালো। তার যখন কিছু ভাবার সময়ের প্রয়োজন হয় তখন এইরকম ঘটা করে পাইপ ধরানোটা বেশ কাজে লেগে যায়। আড়ম্বর করে পাইপ ধরানো শেষ করে কয়েকটা পরীক্ষামূলক ধোঁয়ার চক্র শূন্যে ছেড়ে সে কথা শুরু করল।

"এই ক্রুস্ট লোকটিকে কতটা বিশ্বাস করা যায়; উদ্ভট্ কল্পনার অভ্যাস আছে নাকি?'

'তাঁর সম্পর্কে 'আছে' না বলে 'ছিল' বলাটাই বেশি প্রযোজ্য হবে। আমার মনে হয় না যেখানেই সে থাক্ না কেন—এতদিনও সে বেঁচে আছে·····। না, আমি তাকে কল্পনাবিলাসী বলতে পারি না। বরং তাকে বলতে হয় রসকষহীন, বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ। যা তাকে বলা হত সেটা সে করতে পারত খুব দক্ষতার সঙ্গে। কিন্তু আমরা তার কাছে কখনোই নতুন পরিকল্পনা বা ভাবনা কিছুই আশা করতাম না।'—রজার বুঝিয়ে বলে।

'আমাদের মতো স্বাধীন সমাজে এইসব দুর্ঘটনার খবর বেশিদিন লুকিয়ে রাখা যাবে না। সেসব সেনেটর ব্ল্যাকমানের কাছে সমালোচনার রসদ জোগাবে।' উইলি শুকনো মুখে মন্তব্য করে।

সেণ্টের ব্ল্যাকম্যান অচেনা উড়ন্ত-বস্তু (ইউফো) যে বিদেশী অনুপ্রবেশের উদাহরণ—এই বক্তব্যের প্রবক্তা। বিদেশী বলতে এক্ষেত্রে পৃথিবীর বাইরের কথা হলা হচ্ছে। তিনি বৈজ্ঞানিকদের দোষারোপ করতেন এই বলে যে তারা সাধারণ লোককে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

রজার বলল, 'সেটা হয়ত সত্যি! কিন্তু একেবারে শেষ উপায় হিসেবে আমি একটা অনুসন্ধানমূলক অভিযানে

রওনা হচ্ছি ফ্রস্টের পরিণতি কি হল তা বের করার জন্য। এই অভিযানে আমার সঙ্গে আরও পাঁচজন সহকারী থাকছে। যদি আমরাও না ফিরি .....'

'তাহলে ব্ল্যাকম্যান থাকুক আর নাই থাকুক, দুঃখের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।' উইলি মন্তব্য করল। 'কিন্তু রজার এইসব ঘটনা সম্পর্কে তোমার ব্যাখ্যা কি ?'

"উইলি, আমি তোমার উপদেশ, পাব বলেই ডেকেছি কারণ আমি এসবের কোনো কিছুই বুঝতে পারিনি। সবুজ মানুষেরা পৃথিবীর সব অংশেই দেখা গেছে এবং পৃথিবীর আবহমণ্ডলের বাইরেও তাদের দেখা পাওয়া গেছে, ফ্রস্টের ব্যাপারটা ঘটার আগে পর্যন্ত এসব কিছুই আমি বরাবরের মতো ইউফোর গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু তুমিও তো ছবিটা দেখলে। এটার ভেতর পরিষ্কার ভাবে একটি চুরুট আকারের মহাকাশযানের চারপাশে কতকগুলি সবুজ মানুষকে দেখা যাচ্ছে। এটা কোনো কল্পনাপ্রবণ মানুষের আঁকা শিল্পীর ধারণা নয়। এটা নির্ভেজাল ইলেকট্রনিক্সের ব্যাপার যাকে ঠকানো যাবে না। আর ফ্রস্ট মাতাল অথবা মানসিক অবসাদগ্রস্তও ছিল না। ভূপৃষ্ঠে রাখা নির্দেশক যন্ত্রে তার মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। আমাকে যেটা সব থেকে বেশি ভাবনায় ফেলেছে তা হলো ফ্রস্টের সবশেষে বলা..."কিন্তু" শব্দটি। বলাই বাহুল্য যে সে যা দেখেছিল তাতে কিছু একটা সন্দেহ তার হয়েছিল। সেটা কি ?"

'ঠিক আছে রজার, পৃথিবীতে যে ধরনের অপরাধমূলক কার্যকলাপ ঘটে সে-সব সম্পর্কে আমার যা কিছু অভিজ্ঞতা তার সবটাই তোমার কাজে লাগবে। আমি কিছু একটা বের করার চেষ্টা করব ঠিকই, কিন্তু তোমাকে বলে রাখি, আশার আলো তেমন কিছু দেখছি না। তবুও যদি মাথায় কিছু খেলে যায় তাহলে তোমার সঙ্গে কোথায় যোগাযোগ করব ?'

—উইলি বোনস তথ্যগুলো টুকে রাখার জন্য নোটবই বের করল।

'তোমাকে একটা নির্দিষ্ট ফোন নম্বর দিচ্ছি,' রজার নম্বরটা দিয়ে বুঝিয়ে বলেন, নম্বরটা পাওয়ার পর মিঃ বি-কে চাইবে। তিনিই আমার উপরওয়ালা যদিও আমার সঙ্গে তার কখনো দেখা হয়নি, এবং তিনি যে কে তাও আমি জানি না। তবে তুমি যদি কোনো ধারণা দিতে পার, তাহলে তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।'

'রজার, আর একটা অনুরোধ তোমাকে করব।' বলে উইলি ফটোটার দিকে তাকাল। কোন কথা না বলে রজার সেটা তাকে দিয়ে দিলেন।

উইলি তার পরের দিন বাসায় ফিরল, তখনও সবুজমানুষ সম্পর্কে বিশেষ এগোতে পারেনি। রজারের মতো সেও বিশ্বাস করতে পারেনি যে লোকগুলি গ্রহান্তরের জীব। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন কোণ থেকে যোগাড় করা সাক্ষ্য প্রমাণকেই বা কি করে অস্বীকার করা যাবে ? তাছাড়া ফ্রস্টের পাঠানো 'চিত্রকেই' বা কি করে তর্ক করে নাকচ করে দেবে।

অচেনা উড়ন্ত জাল ছবি সম্পর্কে সে আগেও শুনেছে—প্রমাণ হিসেবে সেগুলি ধোপে টেঁকেনি। কিন্তু এ ছবিতো 'নাসার' (NASA) নিজস্ব বৈজ্ঞানিকের তোলা এবং উচ্চমানের রসায়নাগারে তাকে প্রস্ফুটিত করা হয়েছে। অতএব ছবির প্রামাণ্য সম্পর্কে সন্দেহ করার অবকাশ নেই।

সে যাই হোক উইলি আরেকটা মতামত নেবে বলে ঠিক করল। কিন্তু এফ. বি. আই-তে তার বিশেষজ্ঞবন্ধুদের মতামত নেওয়া যাবে না। কারণ, ছবিটার উপর 'একান্ত গোপনীয়' কথাটা লেখা ছিল। এমন কি ওটা তার পাওয়ারও কথা নয়। অতএব সে তার ঘনিষ্ঠ এক বিশেষজ্ঞ বন্ধুকে দিয়ে ছবিটা গোপনে পরীক্ষা করাবে বলে ঠিক করল।

জর্জ বাল্ডউইন এই কাজের উপযুক্ত লোক। তিনি একজন জ্যোতির্বিদ এবং টেলিস্কোপের মাধ্যমে প্রাপ্ত সৌরজগত এবং মহাবিশ্বের নানা তথ্যকে বিশ্লেষণ করার উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক যন্ত্রপাতি বহুল পরিমাণে ব্যবহার করে থাকেন। এই রকম অবস্থায় জর্জ তাঁকে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারবে। ওয়েস্ট কোস্টে জর্জের ল্যাবোরেটরিতে দূরপাল্লার ফোনে যোগাযোগ করল উইলি।

'জর্জ নাকি! উইলি বোনস্ বলছি—আছ কেমন ? শোন, একটি ছবি পরীক্ষা করতে পারবে ? ব্যাপারটা ভীষণই জরুরী।'

'তুমি তো যা চাও সেটাই জরুরী। সে যাই হোক, আমি আজই পর্যবেক্ষণের জন্য পালোমার রওনা হচ্ছি। দুরাত্রি থাকব সেখানে। তারপর পায়ে হেঁটে মেক্সিকো পর্যন্ত যাওয়ার পরিকল্পনা আছে।'

'পায়ে হাঁটার অংশটা বাদ দিতে হবে। আমি দু'দিনের মধ্যে লস্ এঞ্জেলস এ তোমার সঙ্গে দেখা করছি।' জর্জকে প্রতিবাদ করার সুযোগ না দিয়েই ফোন নামিয়ে রাখল।

উইলি খুব দ্রুত মনে মনে হিসেব করে নিল কেপকেনেডি থেকে রজারের অভিযান দশদিন পরে শুরু হবে। জর্জের কাছে ছবিটা পরীক্ষা করাতে দুইদিন নষ্ট হবে। তাহলে থাকল আর আটদিন। যদি কিছু বের করা যায় তাহলে 'মিঃ বি'-কে সেসব জানাতে একটা দিন দরকার হবে। অতএব অনুসন্ধান করে সত্য উদ্ঘাটন করার জন্য সে পাচ্ছে খুব জোর এক সপ্তাহ।

দু'দিন বাদে জর্জের সঙ্গে তার ল্যাবোরেটরিতে দেখা হলো। প্রাথমিক মান অভিমান এবং অভ্যর্থনা ইত্যাদির পালা শেষ হলে উইলি জর্জকে ছবিটা দেখাল। ছবির

পেছনে সবরকম সরকারি ছাপ ছোপ উইলি যত্ন করে তুলে দিয়েছিল।

'এটা বোধহয় কোনো রকমের রসিকতা। তুমি এটা অনায়াসে কোনো কল্পবিজ্ঞানের পত্রিকায় ছাপিয়ে দিতে পার।'—জর্জ একটু বিরক্তভাবেই বলল।

'বেশ তো, দেখ না তুমি এর থেকে কি বার করতে পার। এটা বাস্তব, নাকি কোনো কল্পবিজ্ঞানের গল্প? জাল, নাকি আসল? বুঝলে জর্জ! এর উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

'এতো সাধারণ ক্যামেরায় তোলা ছবি নয়, আণবিক শক্তি পরিচালিত ক্যামেরায় তোলা বলেই মনে হচ্ছে। যদিও সে কথা তোমাকে বলার দরকার নেই। তবে খালি চোখে যা দেখা যাচ্ছে এর ভেতরে তার থেকেও কিছু বেশি থাকতে পারে। তুমি আসলে কি বের করতে চাইছ?' জর্জ জিজ্ঞেস করল।

'তা জানলে তো ভালই হত। আসলে এই ছবিটা প্রতি বর্গমিলিমিটার পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তোমাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এতে তোমার কতটা সময় লাগবে বলে মনে কর।' উইলি উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করল। 'একসপ্তাহ! আর যদি রোজের ঘুম কমিয়ে দেই তাহলে একটু কম লাগতে পারে।'—জর্জ জানাল।

উইলি একটু হেসে একটা ট্যাবলেটের শিশি টেবিলের উপর রাখল।

'তোমার ঘুমের ইচ্ছা পঞ্চাশভাগ কমিয়ে দেওয়ার জন্য এগুলি গ্যারান্টিযুক্ত। এই কাজটা হয়ে গেলে তুমি ওটা পুষিয়ে নিতে পারবে।'

পদ্ধতি মেনে কাজ করার জন্য জর্জের খ্যাতি ছিল। কিন্তু উইলি তাকে এই কাজ করতে দেখল সামনে থেকে। জর্জের পর্যবেক্ষণের যন্ত্রপাতিগুলি যে কতখানি উচ্চমানের তা দেখে সে খুব অবাক হলো।

উইলি ছবিটার সবুজমানুষগুলোর প্রত্যেকটির আঙুলগুলো পর্যন্ত আলাদা করে বুঝতে পারছিল।

'এই রকম যন্ত্রপাতি আরও অনেক আছে নাকি পৃথিবীতে।'—উইলি প্রশংসার সুরে জিজ্ঞেস করল।

জর্জ খুব সাধারণভাবে উত্তর দিল, 'আমি তো আর একটার কথাও জানি না। এটা নিজের ব্যবহারের জন্য আমিই তৈরি করে নিয়েছিলাম।'

কিন্তু এতসব যন্ত্রপাতি হাতের কাছে থাকতেও জর্জ সময় কমাতে পারল না। ঘণ্টা শেষ হয়ে দিনে পড়ল। দিন শেষ হতে হতে একসময় নির্ধারিত সপ্তাহও প্রায় শেষ হতে চলল। কিন্তু সে ছবিটা থেকে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য সূত্র বার করতে পারল না যা দিয়ে ক্রস্টের শেষ কথা 'কিন্তু'—র ব্যাখ্যা করা যায়। অতএব 'মিঃ বি'-কে জানানোর মতো কিছুই থাকল না।

সপ্তম দিনে তাদের গবেষণাগারে একটি খুদে অতিথি এসে উপস্থিত হলো। সে হলো জর্জ বাল্ডের দশবছরের ছেলে জর্জ জুনিয়ার। জুনিয়ার খুব বুদ্ধিমান, কিন্তু খুবই অনুসন্ধিৎসু। উত্তর দেওয়া কঠিন এমন সব প্রশ্ন করে করে সে উইলিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল। একটু ফাঁক পেতেই উইলি তাকে জিজ্ঞেস করল, 'জর্জ জুনিয়ার, তোমাকে একটা প্রশ্ন করব। 'তুমি আজ এখানে এসেছ কেন, আর কতক্ষণই বা এখানে থাকতে চাও?'

'তুমি তো দুটো প্রশ্ন করেছ', জর্জ উত্তর দিল। 'আমি বাবাকে সাহায্য করতে এসেছি, আর যতক্ষণ না সে কাজ শেষ হচ্ছে ততক্ষণ অপেক্ষা করব। কারণ তারপরে আমরা 'পদব্রজে' বেড়াব। এর মধ্যেই আমাদের একসপ্তাহ দেরী হয়ে গেছে।

অবশেষে বিকেল নাগাদ জর্জ তার কাজ শেষ করল। সে উইলিকে কম্পিউটর কেন্দ্রের কাছে ডেকে কি করে যন্ত্রটা চালাতে হয় সব বুঝিয়ে দিল। 'এখন তুমি ইচ্ছে মতো ছবিটার যে কোনো অংশ পর্দায় ফুটিয়ে তুলে সেটা যতটা সম্ভব বড় করে দেখতে পারবে। যতটা তথ্য জোগাড় করতে পেরেছি আমি তা টেপের মধ্যে নথিভুক্ত করে রেখেছি। শুভেচ্ছা রইল!'

জর্জ হাতমুখ ধুয়ে একটু পরিষ্কার হতে গেল। আর উইলির মধ্যে হতাশা যেন থাবা গেড়ে বসল। সে বুঝতে পেরেছিল যে তার গবেষণায় কিছুই উল্লেখ করার মতো বেরোবে না। যদি তেমন কিছু অস্বাভাবিকতা থাকত, তাহলে তা কি আর জর্জের নজরে পড়ত না? তবুও সে যন্ত্রটিকে পরিচালনা করতে শুরু করল। তবে যত টানা অনুসন্ধানের তাগিদে তার বেশিটা জর্জ জুনিয়ারের প্রশ্নের চাপে অস্থির হয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীমান যন্ত্রটিকে দখল করে ছবিটার বিভিন্ন অংশ পর্দায় প্রতিফলিত করতে শুরু করল।—'ওহ!' 'আচ্ছা, ওই সবুজ মানুষগুলোর কি সত্যিই অস্তিত্ব আছে?', 'ওই মহাকাশ-যানটা কি ধরনের?'—এই রকম নানা মন্তব্যও সংগে সংগে শুরু হলো।

'দেখ, দেখ, ওই লোকটা হ্যামবার্গার খাচ্ছে' 'জর্জ-জুনিয়ার আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল। 'আহা, আমিও যদি একটা পেতাম।'

'একটা পাক্কা মার্কিনী বাচ্চা'—উইলি মনে মনে ভাবল। কারণ, সে হ্যামবার্গার এবং অন্যান্য মুখরোচক খাবার মোটেই পছন্দ করত না। হঠাৎই জুনিয়ারের মন্তব্যের অন্য তাৎপর্য তার কাছে ধরা পড়ল।

সে দৌড়ে যন্ত্রটার কাছে গিয়ে জুনিয়ারকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই সরিয়ে দিল, 'কোথায়? তুমি এসব কোথায় দেখলে?'

জুনিয়ার একটা সবুজ মানুষের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল। সে 'স্যাণ্ডউইচের' মতো কিছু একটা চিবাচ্ছিল। উইলি ছবির ঐ বিশেষ অংশটা পর্দায় বড় করতে শুরু করল, যতক্ষণ না স্যাণ্ডউইচটা পরিষ্কার ভাবে দেখা গেল।

জুনিয়ার বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উক্তি করল, 'আমাকে বোকা বানাতে পারবে না। আমি 'বিগ ম্যাক' মার্কা হ্যামবার্গার একবার দেখলেই চিনতে পারি।'

'তা হলে, তুমি আমার একটা বিরাট সমস্যার সমাধান করেছ। যদি সত্যি হয় তবে তুমি একটার জায়গায় দুটো 'বিগ ম্যাক' পাবে।'—এক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম উইলির মুখ দিয়ে হাসি বেরোল।

লস এঞ্জেলেস থেকে ওয়াশিংটন যাওয়ার শেষ বিমানের আসনে গা এলিয়ে দিয়ে গত তিন ঘণ্টায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করল।......কিভাবে জর্জ স্নানের ঘর থেকে ফিরে এসে ছেলের আবিষ্কারের কথা শুনল.....বিষয়টার গুরুত্ব অনুধাবন করে কিভাবে 'স্যাণ্ডউইচটার' একটি বিশাল ছবি তৈরি করল যেটাকে জুনিয়ার আবার 'বিগম্যাক' বলে রায় দিল......কিভাবে উইলি মিঃ 'বি' কে টেলিফোন করল এবং কিভাবে সব আসন পূর্ণ থাকা স্বত্বেও এই শেষ বিমানে তার জন্য একটা আসনের ব্যবস্থা করা গেল...... ।

অতএব বোঝা গেল সবুজ মানুষেরা গ্রহান্তরের প্রাণী নয়। তারা সব আমেরিকার অধিবাসী। তাহলে এরা কি মহাকাশযান ছিনতাইকারী (স্পেস জ্যাকার)—অর্থাৎ কোনো নতুন ধরনের ছিনতাইকারী দল যারা উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন বিজ্ঞানীদের এই কাজে লাগাচ্ছে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে মুক্তিপণ দাবি করছে?........তাহলে তারা সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়িয়ে কি করছে?......হয়ত মিঃ 'বি' এই রহস্যের উপর কোনো আলোকপাত করতে পারবে।

ডালাস বিমান বন্দরে মিঃ 'বি' ফোনে যেমন বলেছিলেন ঠিক সেই রকম চিত্র বিচিত্র টাই পরা একজন যুবক উইলির সঙ্গে দেখা করল।

'আমার নাম জোনাথান,' সে নিজের পরিচয় দিল।

'আমার নাম উইলি।'

'চলুন যাওয়া যাক মিঃ 'বি' আবার অপেক্ষা করছেন' জোনাথান উইলির ব্যাগ তুলে নিয়ে একটা কালো 'লিমোসিন' গাড়িতে নিয়ে তুলল। চালকের আবার উর্দি পরা ছিল।

'গাড়িটা তো বেশ অদ্ভুত ধরনের!' উইলি ভেতরে ঢুকে বসতে বসতে মন্তব্য করল। বাইরের লোকেরা গাড়ির ভেতর পর্যন্ত দেখতে পেলেও, গাড়িটা যখন বড় রাস্তা দিয়ে ছুটে চলল তখন উইলি ভিতর থেকে বাইরের কিছুই দেখতে পেল না।

'মিঃ 'বি' একটু লাজুক প্রকৃতির লোক। তিনি কোথায় কাজ করে এটা তিনি দেখতে দিতে চান না,'—জোনাথান কৈফিয়েতের সুরে বলল।

উইলি ওয়াশিংটনের গোটা এলাকা খুব ভালভাবে চিনত। সে যাওয়ার রাস্তাটা মনে মনে ছকে নেওয়ার চেষ্টা করল। শহর ঘুরে বেল্টওয়েতে পড়ে তারা ভার্জিনিয়ার দিকে মোড় ঘুরল। কয়েক মাইল যাওয়ার পর উইলি বেশ বুঝতে পারল যে তারা একটা ছোট রাস্তা ধরে বেড়িয়ে গেল। কিন্তু তার পরই গাড়ির চালক এত এদিক ওদিক মোড় ঘুরল এবং সামনে পিছনে এল গেল যে উইলি রাস্তা বোঝার আশা ছেড়ে দিল। এইবারে মাটির তলায় একটা গাড়ি রাখার জায়গায় লিফ্টের কাছ ঘেঁসে গাড়ি এসে থামল। জোনাথান উইলিকে খুব দ্রুত টেনে নিয়ে লিফটে তুলে দিল যাতে সে জায়গাটাকে চিনে নিতে না পারে। তারপর তারা এসে পেঁছাল তেরো তলায়।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে জোনাথান 'বি' লেখা একটা সাদামাটা দরজায় কড়া নাড়ল।

দরজা খুলে গেল, জোনাথান উইলিকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল এবং বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ঘরে কিন্তু কেউ ছিল না।

সেখানে কেবলমাত্র একটি টেবিল এবং তার সামনে একটা চেয়ার বসানো ছিল। উইলি যখন এরপর কি করবে ভাবছিল তখন টেবিলের পেছন থেকে ভেসে আসা কতকগুলো কথা শুনতে পেল:

'মিঃ উইলি, অনুগ্রহ করে চেয়ারে বসুন।' খুব সম্ভবতঃ চেয়ারের পেছনে কোন স্বরক্ষেপক যন্ত্র লুকোন আছে। অতএব উইলি চেয়ারে বসে পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকল।

'আমার চরম লজ্জাশীলতার জন্য মুখোমুখি দেখা করতে পারছি না বলে আমি দুঃখিত। আমি কিন্তু আপনাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আপনি যদি আমাকে কিছু দেখাতে চান, তাহলে সেটা টেবিলের উপর পেতে রাখুন।' কথাগুলো একটানা অকম্পিত স্বরে ভেসে এল।

'মিঃ 'বি' আমি আপনাকে এমন কিছু বলতে চাই যা রজার বাক্‌ল্যাণ্ড এবং তার সঙ্গীদের অনর্থক অভিযান এবং এমন কি সম্ভবত তাদের প্রাণও বাঁচানো যেতে পারে।' উইলির কথার স্বরে একটা উৎকণ্ঠার ভাব মেশানো ছিল। কিন্তু মিঃ বি-র কণ্ঠস্বরে কোনো চমক কিংবা আগ্রহ কিছুই লক্ষ্য করা গেল না।

'দয়া করে কথা চালিয়ে যান, আমি শুনতে পাচ্ছি। আপনার কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে বলে যদি প্রমাণ করতে পারেন তাহলে, সেই শেষ সময়েও, আমি মহাকাশ অভিযান বন্ধ করতে পারি।'

'রজার আমাকে সবুজ মানুষের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে জানিয়েছিল। সে আমাকে বলেছিল যে সে আগামীকাল তাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য অভিযান শুরু করবে। কি তাদের পরিচয়? কোন দূরের গ্রহ থেকে তারা এসেছে……। কিন্তু সে আমাকেও আলাদাভাবে অনুসন্ধান করার জন্য বলেছিল। সে ডিক্ ফ্রস্টের তোলা একটা চিত্রও আমাকে দিয়েছিল—'উইলি কথা বলতে বলতে হঠাৎ বাধা পেল।

'এতো ভীষণ রকমের শৃঙ্খলা ভঙ্গের নমুনা। এই-ভাবে গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করে দেওয়া উচিৎ হয়নি রজারের। যাই হোক্। এখন বুঝতে পারছি রজার আমার ফোন নম্বরও আপনাকে দিয়েছিল। আপনি কি কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছেন?'

'আমি এই ছবিটাকে একজন বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি। আমার মনে হচ্ছে এমন কিছু আমি বের করেছি যা এখানকার বিশেষজ্ঞরা খেয়াল করেন নি।' উইলি টেবিলের উপরে ছবিটা রেখে বুঝিয়ে দিল কিভাবে ছবিটার বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। তারপর সে মন্তব্য করল, 'এই রহস্যময় মহাকাশযানটির একজন অভিযাত্রীকে আমেরিকায় প্রচলিত মুখরোচক একটি বিশেষ খাবার খেতে দেখা গেছে। এতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, এই অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের গ্রহের লোক, এবং খুব সম্ভবতঃ আমাদের দেশেরই অধিবাসী। মনে হয় তারা কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের বৈজ্ঞানিকদের এবং প্রযুক্তিবিদ্‌দের অপহরণ করছে। অতএব আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আগামীকাল আর কোনো অভিযাত্রী দলকে না পাঠানোই ভাল। বরং আপনাদের উচিৎ এই দুষ্কৃতকারীদের মোকাবিলা করার জন্য সশস্ত্র বাহিনী পাঠান।'

বেশ কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। মনে হয় মিঃ বি বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে কিছু সময় নিলেন। এরপর তিনি বললেন, 'অভিনন্দন! মিঃ উইলি! আপনি একটা বড় রহস্যের সমাধান করেছেন। আমি রজারের অভিযান নিশ্চয়ই বন্ধ করব। কিন্তু কৃতিত্বটা আপনাকেই দিতে চাই। আপনি অল্পক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করুন। আপনাকে ফ্লোরিডা পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। আপনি সেখানে যান এবং আপনি যা আবিষ্কার করেছেন তা রজারের কাছে ব্যাখ্যা করুন।'

রজারের বাড়ি থেকে সাতদিন আগে বেরোনোর পর উইলি এই প্রথম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

মিঃ বি তার কালোরঙের টেলিফোনের গ্রাহক যন্ত্রটি নামিয়ে রাখলেন। এই ফোনটার মাধ্যমে তিনি তাঁর সহকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। এইমাত্র জোনাথানকে এরপর কি করতে হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। এবার টেবিলের উপর থেকে সবুজ ফোনটি কথা বলার জন্য তুললেন। টেবিলে আরও একটা লাল রঙের ফোন রাখা ছিল।

'মিঃ 'এ' বলছেন?' সে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

'এই যে 'বি'। সব কেমন চলছে? সব প্রস্তুত তো?'

'হ্যাঁ সব কিছুই প্রস্তুত ছিল। কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। উইলি বোনস্ নামে একজন এফ. বি. আই-এর চর এইমাত্র আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। সে পরীক্ষা করে বার করতে পেরেছে যে সবুজ মানুষেরা আমাদের দেশেরই লোক।'

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে বিস্ময়সূচক শব্দ ভেসে এল। কিন্তু 'এ' জানতেন কি করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। উইলি 'বি'-কে যা যা বলেছিল তার বিশদ বিবরণ শুনতে চাইলেন তিনি। সব শোনা হয়ে গেলে তিনি মন্তব্য করলেন:

'লোকটা নিশ্চয়ই মাইক! মুখরোচক খাদ্য খাওয়ার ব্যাপারে ওটা একটা রাক্ষস। গেল মাসে ওকে হ্যামবার্গার খেতে দেখেছিলাম। শেষ পর্যন্ত গুনে তাল রাখতে পারিনি। একটার পর একটা খাচ্ছে আর বলছে আরেকটা খেলে কিছু ক্ষতি হবে না……। এইভাবে অনেকগুলো খেয়ে ফেলল।'

কিছুক্ষণ আবার সব চুপচাপ। তারপর 'বি' বেশ ক্ষুব্ধভাবে বললেন, 'এবার আমরা কি করব? মনে হচ্ছে পৃথিবী জুড়ে চর-চক্র স্থাপনের ব্যাপারটা এমন সময়ে মাটি হয়ে গেল। যখন কেবলমাত্র ব্যাপারটা শুরু হয়েছে এবং তাও বেশ ভালভাবে। রজার এবং তার সঙ্গীদের অপহরণ করতে পারলেই চারদিকে বহির্বিশ্বের আগন্তুক নিয়ে বেশ সোরগোল পড়ে যেত। সেনেটর ব্ল্যাকম্যান এনিয়ে তুলকালাম করত। এটা আন্দাজ করেই আরেকটা তদন্তের পরিকল্পনাও ভেবে রেখেছিলাম। ঐ তদন্তের সময় সব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকরা আবার বলতেন যে বহির্বিশ্বের আগন্তুক বলে কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তার এইসব গোলমালের ফাঁকে সবুজ মানুষেরা নিজেদের গুপ্তচর বৃত্তি অপ্রতিহত ভাবে চালিয়ে যেতে পারত। এত সুন্দর ভাবে সব পরিকল্পনা করা হয়েছিল ……মাইকের হ্যামবার্গার খাওয়ার লোভের ফলে সব ভেস্তে গেল।'

'বি, তুমি এমনভাবে বলছ যে পরিকল্পনাটি যেন একটা অতীতের ব্যাপার! না। পরিকল্পনা এখনও বজায় আছে।' 'এ' বেশ গম্ভীরভাবে বললেন।

'উইলি এগুলো চারদিকে বলে বেড়ালে কি করে আমরা কাজ চালাতে পারব। ও এতক্ষণে ফ্লোরিডার পথে রওনা হয়ে গেছে। 'বি' নিজেকে আর চেপে রাখতে পারে না।

'চমৎকার! আমি নিজেও এই পন্থাই নিতে বলতাম। আমরা রজারের সঙ্গে ওকেও সেই গোপন আস্তানায় পাঠিয়ে দেব। সেখানে গিয়ে যতখুশি অনুসন্ধান করতে থাকুক।'

এইবার 'বি' ব্যাপারটা বুঝল। অপহৃত বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্‌দের বসতিতে উইলিকেও ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। ফলে কেউই আর বেশি কিছু জানতে পারবে না। কিন্তু মাঝে মাঝে বিবেকের তাড়নায় যে অনুভূতি হত তা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সে 'এ'-র কাছে তা প্রকাশ করল, 'যে জাতি ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার প্রভৃতির জন্য অহংকার করে তাদের পক্ষে নিজেদের নাগরিকদের অপহরণ করে নির্বাসনে সকলের থেকে পৃথক করে রাখা কি যুক্তিযুক্ত হচ্ছে?'

কিন্তু 'এ'-র কাছে এইসব প্রশ্নেরই যেন সমাধান ছিল। সে ঠাণ্ডামাথায় বলল, 'নিজের দেশের অধিবাসীকে অপহরণের জন্য কোন জাতিকে অভিযুক্ত করা যায় না। তাছাড়া যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের অপহরণ করা হয়েছে তারা সকলেই স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে জীবনযাপন করছেন দেশের নিরাপত্তা সমস্যার সমাধান করার জন্য কাজ করার তৃপ্তিও তারা পাচ্ছেন। তাছাড়া দশবছর বাদে যখন পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন সকলেই ফিরে আসতে পারবে।'

'বি' এতে সন্তুষ্ট হলো তাছাড়া যে প্রকল্পে দেশের সব শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরদের দরকার সেখানে এছাড়া পথও তো নেই। এর ফলে বাইরে কোন সন্দেহের রেখাপাত না করেই গোপনে কাজ করা যাবে। এবং 'বি' জানত যে সব অপহৃত বৈজ্ঞানিকরাই সামান্য মগজ ধোলাই-এর পর বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে কাজ করে যাচ্ছে। এমন কি 'ফ্রস্ট'ও তার নতুন কাজ বেশ উৎসাহের সঙ্গে শুরু করেছে।

ভেতরের ভাবনা যেন আপনমনে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে সেইভাবে 'এ' বলতে থাকল, 'আপনি ম্যানহাটান প্রকল্পের কথা স্মরণ করুন। সেখানে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকরা ভয়ানক মারণাস্ত্র তৈরি করার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করেছেন শুধুমাত্র এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, তারা জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কাজ করছেন। সব বৈজ্ঞানিকই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবেন যদি তাদের প্রকল্পের গুরুত্বটা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করানো যায়। আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিকদের এবং প্রযুক্তিবিদদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে এই মহাকাশ-যুগে পৃথিবীর জমিদখলের চেয়ে পৃথিবীর চারপাশের আকাশের দখলরাখা অনেকবেশি গুরুত্বপূর্ণ। অতএব তারা আনন্দের সঙ্গে এই প্রকল্পে কাজ করে যাচ্ছেন।' 'ঠিক আছে।' দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে 'বি' আত্মগতভাবে বলল, "এভাবেই কাজটা করতে হত, এছাড়া পথ ছিল না।" 'সে' নিজেও একসময় বিজ্ঞানচর্চা করত। তাই বৈজ্ঞানিকদের এভাবে রাজনৈতিক দাবার বোড়ে বানানো হয়েছে দেখে মনে মনে দুঃখ অনুভব করল। এ বন্ধ করার জন্য কিছু করার ক্ষমতা তার নেই। তাছাড়া অতীতেও একই ঘটনা বারবার ঘটেছে।

যাই হোক তাড়াতাড়ি কাজের কথায় ফিরে এল, 'আচ্ছা। এবার আমাদের একটা সরকারি প্রথা অনুসরণ করতে হবে।'

'সেটা আবার কি?'—'এ' জিজ্ঞেস করল। উইলি তো আমাদের সংস্থায় কাজ করে না। তাকে অপহরণ করতে হলে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাগবে।'

'সে সব ব্যবস্থা আমি করব। বিদায়।'—'এ' খুব হালকা ভাবে বলল।

'বি' যখন তার সবুজ টেলিফোনটা ছাড়ল তখন সে মনে মনে উইলিকেও চিরবিদায় জানাল। সে জানত 'এ' কত তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে। অতএব পরবর্তী ঘটনাও খুব তাড়াতাড়ি ঘটবে। তার ভাবনার কিছু রইল না।

তার টেবিলের লালরঙের টেলিফোনটা ততক্ষণে বাজতে শুরু করেছে।

চিকিৎসাবিদ্যায় মানবদেহ

ননীগোপাল দাস

মানবদেহের গঠন (এনাটমি) এবং তার প্রতিটি অংশের কাজ (ফিজিওলজি) সম্বন্ধে খুটিনাটি প্রতিটি বিবরণ জানতে হলে শুধু বই পড়ে বা তার ছবি দেখে সম্পূর্ণ ভাবে জানা মোটেই সম্ভব নয়। প্রয়োজন একটি মানবদেহ। কিন্তু জীবিত মানুষের অভ্যন্তর চট্ করে একজন ছাত্রের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়—সেইজন্য চাই একটি মৃতদেহ। শব ব্যবচ্ছেদ করে সব কিছুই হাতে ধরে দেখে নেওয়া যায় এবং মানবদেহের গঠন প্রণালীর একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মায়। শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করে এনাটমি শিক্ষা বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত, এবং আজও পৃথিবীর প্রায় সব দেশই এই পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল।

এ ব্যাপারে হিপ্পোক্রেটস্ (468—367 বি. সি), গেলেন্ (130—200 এডি), এন্ড্রিয়াস্ ভেসালিয়াস (1514—1564 এডি) ও আরও অনেকের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখি। ভাবতেও অবাক লাগে সপ্তবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে লোভেনের এনাটমির অধ্যাপক ভারহেইন সাহেবের একটি পা আঘাতজনিত কারণে কেটে বাদ দিতে হয়েছিল এবং পরে তিনি সেই পা নিজের হাতে ব্যবচ্ছেদ করে ছাত্রদের এনাটমি শিক্ষা দিয়েছিলেন। মৃতদেহ যোগাড়ের ব্যাপারে একটা খারাপ দিকও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে সেই সময়। মেডিকেল স্কুলগুলিতে মৃতদেহ বিক্রয়ের জন্য এডিনবরা ও লণ্ডনে রবার্ট নক্স, বার্ক ও হেয়ার নামক ব্যক্তি বেশ কয়েকটি লোককে খুন করে মৃতদেহ যোগাড় করে। স্বাভাবিক ভাবেই এতে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সবাই ভাবতে শুরু করেন এবং তার ফলেই জন্ম নেয় 1832 খৃষ্টাব্দের 'এনাটমি এ্যাক্ট'। এখানে বলা হল বেওয়ারীশ মৃতদেহ মেডিকেল কলেজগুলিতে শিক্ষার জন্য ব্যবহার করা যাবে। এখানে আরও বলা হল কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজের দেহ মৃত্যুর পরে ব্যবহারের জন্য মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দান করে যেতে পারবেন। এইভাবেই শবদেহের ব্যবহার শিক্ষার জন্য আইনসিদ্ধ হল।

মেডিকেল কলেজগুলিতে সবদেহের প্রয়োজন কারণ আমাদের দেশে বর্তমানে শবব্যবচ্ছেদই এনাটমি শিক্ষার প্রধান মাধ্যম। আবার এই বেওয়ারীশ শবদেহে পচনরোধও কাম্য, কারণ এগুলিকে অনেকদিন পর্যন্ত অবিকৃত রাখতে হয়। এক একটি শবদেহ অনেক দিন ব্যবহার করা হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মৃতদেহের পচনরোধ করা হয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য। জল, ফরমেলিন্, সোডিবাই কার্ব, গ্লিসারিন, আরসেনিক ও কিছু সিঁদুর মিলিয়ে যে জলীয় পদার্থ হয় সেটি একটু চাপের সংগে একটি যন্ত্রের সাহায্যে মৃতদেহের উরুর উপরিভাগে একটি বড় ধমনী (ফিমোরাল

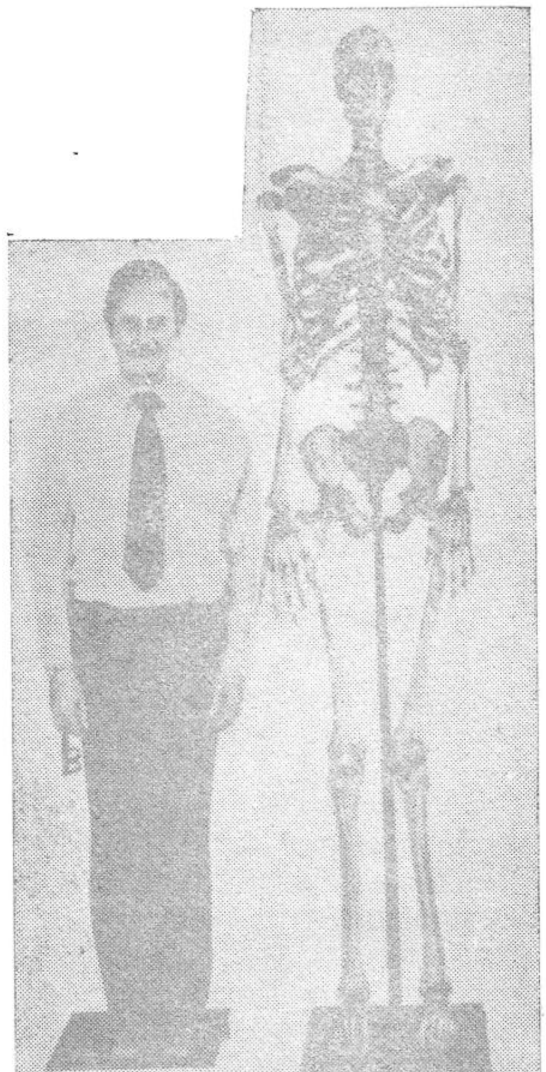

ছবিটিতে যে কঙ্কালটি দেখা যাচ্ছে, সেটা এখন লণ্ডনের হাণ্টেরিয়ান মিউজিয়ামে রাখা আছে। লম্বায় আট ফুট দুই ইঞ্চি, সংরক্ষিত কঙ্কালদের মধ্যে পৃথিবীর বৃহত্তম। এই মানুষটিকে 'আইরিশ দৈত্য' বলা হত, নাম চার্লস্ ও ব্রেইন্, মৃত্যু দিবস 1লা জুন, 1783 খৃষ্টাব্দ। তখনকার দিনের বিখ্যাত সার্জন জন হাণ্টার (1728—1793 খৃষ্টাব্দ) এই কঙ্কালটি তৈরি করার জন্য শবদেহটি 500 পাউণ্ড দিয়ে অনেক কষ্ট করে কিনেছিলেন এবং তাঁর তৈরি এই মূল্যবান জিনসটি আজও রয়েল কলেজ অব্ সার্জনস্ এর মিউজিয়ামে শোভা পাচ্ছে।

আর্টারি)-তে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। তারপর মৃতদেহ হিমঘরে রেখে দেওয়া হয়। মৃতের অস্থি নিয়ে যে কঙ্কাল তৈরি হয় সেটাও কিন্তু শিক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু যে মৃতদেহকে উপরি উক্ত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয় সেই দেহের কঙ্কাল তৈরি করা যায় না—কারণ ঐ অস্থিগুলি খুবই ভঙ্গুর হয়ে যায়। সেজন্য যে মৃতদেহ থেকে কঙ্কাল তৈরি হবে সেটিকে রাসায়নিক সংরক্ষণ করা হয় না, ঐ মৃতদেহে পচন ধরলেও ক্ষতি নেই। এর মাংসপেশী ও অন্যান্য নরম অংশ কেটে ফেলে দেওয়া হয় এবং শুধু অস্থিগুলি নিয়ে পরিষ্কার করে নানা পদ্ধতিতে শুকিয়ে সাদা ধবধবে করে ফেলা হয় যাতে কোন গন্ধ পর্যন্ত থাকে না। সেই অস্থিগুলি জোড়া দিয়ে পূর্ণ কঙ্কাল তৈরি হয়। হিমঘরে সংরক্ষিত শবগুলি যে শুধু ব্যবচ্ছেদ করেই শিক্ষার ব্যবস্থা হয় তা নয়, এগুলি থেকে অনেক সময় হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস বা যে কোন অংশ কেটে ভিন্নভাবে ফরমেলিনে ডুবিয়ে রেখে বহু বৎসর ব্যবহার করা হয়।

রঙ করা খাবার কপিঞ্জল শর্মা

পড়তে পড়তে মিনি দাদুকে প্রশ্ন করলে—বলতে পার দাদু, কোন দেশে জিলিপি তেড়ে এসে কামড় দিতে চায় ?

দাদু ভাবলেন একটু। তারপর ফোকলামুখে হাসতে হাসতে বললেন—যে দেশে জিলিপির এত ছড়াছড়ি—সে আমাদেরই দেশে।

মিনি অবিশ্বাসের সুরে বললে—ইঃ! আমাদের দেশ বুঝি মজার দেশ ?

—মজার বলতে মজার! এদেশে চোখ খুলে কেউ দেখতে চায় না, বুঝলি। সবাই চোখ বন্ধ করে দেখে। কবির কথা ষোল আনাই খাঁটি।

—ধ্যেৎ! জিলিপি কি কখনও কামড়ায় ? নাকি ওর দাঁত আছে ?

দাদু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন—দাঁত নেই, তবু কামড়ায়। আচ্ছা করেই কামড়ায়। শুধু আমরা জানতে পারি না।

ভুরুটো কুঁচকে মিনি এবার জিজ্ঞাসা করলে—তাহলে কেমন করে কামড়ায় দাদু!

—সে এক তাজ্জব ব্যাপার! আমরা ওকে মুখে পুরে কুড়মুড় করে চিবিয়ে, রসিয়ে রসিয়ে, বেশ করে পেটে চালান করে দিই। আর পেটে গেলেই যেন জ্যান্ত হয়ে উঠে। টুকরোগুলো হাজার হাজার কেউটের মত তেড়ে আসে। আর সেকি কামড় রে! কাল কেউটের কামড়ে বরং রক্ষে আছে, কিন্তু জিলিপির কামড়ের কাছে ডাক্তার বদ্যির কোন জারিজুরি খাটে না।

মিনি বললে—তুমি ভারি মিছে কথা বল দাদু।

জিলিপি খেতে ভালো হলেও জিলিপির প্যাঁচে শতেক ব্যাধির আমদানি হয়। এমনকি ক্যানসারও।

—ক্যানসার আবার কি জিনিস দাদু ?

—এক রকমের রোগ। ধরলেই সোজা যমের বাড়িতে নিয়ে যায়।

—হি হি করে হেসে উঠলে মিনি। বললে—এবার বুঝেছি। জিলিপি খেলে অসুখ হয়। তা কেন হয় দাদু ?

—দোকানদাররা মেটানিল ইওলো বলে এক ধরনের হলদে রঙকে জিলিপির সঙ্গে মেশায়। আবার শুধু জিলিপি নয়, গুঁড়ো হলুদ ও গুঁড়ো লঙ্কাকে চকচকে ও বাহারে করার জন্য রঙটাকে হামেশাই মিশিয়ে দেয়।

মিনি এবার জিজ্ঞাসা করলে—শুধু জিলিপি আর গুঁড়ো মশলা ছাড়া কোথাও রঙ মেশানো হয় না বুঝি ?

হো হো করে হেসে উঠলেন দাদু। বললেন—এই আজব দেশের কোথায় কোন খাবারে রঙ মেশানো হয় না তাই জিজ্ঞাসা কর। বাজারের সরবতে-আইসক্রীমে, লজেঞ্জুস-চকোলেটে, চপ-কাটলেট মিষ্টিতে, হোটেল রেস্তোরাঁর মুখরোচক খাবারে, কোন কোন ওষুধে ও বিস্কুটে, সর্বত্রই অরামিন, ম্যালাকাইট গ্রীন, মেটানিল ইওলো, লেড ক্রোমেট, অ্যামারেন্থ প্রভৃতি রঙের ঢালাও কারবার। এমনকি তরিতরকারিকে সবুজ রাখতে ডোবাচ্ছে তুঁতের দ্রবণে। যার জন্যে অসুখ-বিসুখে ছেয়ে যাচ্ছে দেশটা। মানবদেহের সমূহ যন্ত্রপাতি—যেমন লিভার, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, মূত্রাশয়, পাকস্থলী, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদিকে ধীরে ধীরে বিকল করিয়ে ছাড়ছে। শুধু কি তাই, ওদের প্রভাবে রক্তের লোহিত কণিকা হচ্ছে ধ্বংস এবং অনেকেই বরণ করছে পক্ষাঘাত ও ক্যানসারের মতো রোগকে।

মিনি এবার গম্ভীর হলো। এক সময় বললে—ও সব ছাই রঙগুলোকে বাদ দিলে তো হয় ?

দাদু হাসলেন আবার। বললেন—অনেক দেশ বাদ দিয়েছে অনেক আগে। আমরাও প্রায় সবাই জেনে গেছি ওদের ভয়ঙ্কর দোষের কথা। তবুও বিজ্ঞাপনের কৃপায় আমরা ভুল করছি আর অহরহ নিজেরা ঐ বিষ পান করছি এবং ছেলেমেয়েদের চরম সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছি।

দাদু একটু থামলেন। পুনরায় বললেন—আজ ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের তাই এত রোগ। এ দেশের বাপ-মারা ডাক্তারদের পয়সা দিতে দিতে নাজেহাল হচ্ছে অথচ জেনে শুনেও রঙের ব্যবহার ছাড়ছে না। এমন আজব দেশ আর কোথাও দেখতে পাবে না।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা
চিত্রনাট্য-অনিল কর্মকার
রূপায়ণ-গৌতম কর্মকার
কিন্তু সেখানে আর কেন ফিরলেন না? শূণ্যযানটা নিয়ে পৃথিবীতে যে ফিরেছিলেন, তাতে তো আর সন্দেহ নেই।
না, তোমাদের সামনে সশরীরে যখন উপস্থিত, তখন ফেরার কথা অস্বীকার করি কী করে? কিন্তু ফেরার পর ওই উন্মাদ বৈজ্ঞানিক লুটভিকই যে শয়তানি করল!
ফিরে আসার সময় তার ঐ আশ্চর্য যন্ত্রের সৃষ্টিছাড়া রহস্যও সব ও বলেছিল।
রকেট-টকেট নয়, তার ঐ শূণ্যযান চলে অ্যান্টিম্যাটারের জোরে। অ্যান্টিম্যাটার মানে হোল- আমাদের দুনিয়ার মূল উপাদানের যেন আয়নায় দেখা উলটো নকল। সে অ্যান্টিম্যাটারের হাইড্রোজেন অ্যাটমে একটা প্রোটনের চারিধারে একটা ইলেকট্রন ঘোরে না।
নেগেটিভ অ্যান্টিপ্রোটনের চারিধারে ঘোরে পজিটিভ পজিট্রন।
অন্য সব উপাদানও তাই। এই অ্যান্টি-ম্যাটারের আঁচ পেলেও কেউ এখনো তা সৃষ্টি করতে পারে নি। করেছে শুধু ঐ উন্মাদ বৈজ্ঞানিক লুটভিক।

অ্যান্টিম্যাটারের সঙ্গে ম্যাটারের সম্পর্ক অহি-নকুলের চেয়ে শত্রুতার। অ্যান্টিম্যাটারে আর ম্যাটারে দেখা হলে দু'জনেই একেবারে বিদ্যুৎ বেগে ছিটকে যায় দু' জনের কাছ থেকে।
দুই বস্তুর ঐ ধর্ম কাজে লাগিয়ে থরের মরুভূমিতে লুটভিক ঐ আশ্চর্য যন্ত্রযান বানিয়েছিল। পৃথিবী ছাড়িয়ে যেতে তার রকেটের মত অসম্ভব বেগ লাগে না।
যেমন খুশী বেগে বেলুনের মত ভাসতে ভাসতেও সে পৃথিবী ছাড়িয়ে যেতে পারে।
হাওয়ার ঘর্ষণে পুড়ে যাবার কোন ভয় তাই ছিল না। সাধারণ আসবাবপত্রেও কোন অসুবিধে হয়নি।
একেবারে শামুকের থেকে আলোর গতিতে বেগ বাড়াবার সময় একমাত্র ভরশূন্যতা ছাড়া কোন অসুবিধে আমাদের ভোগ করতে হয়নি।
মঙ্গলগ্রহে নামতেও পেরেছি নিরাপদে, আবার ফিরেও এলাম নিরাপদেই -সেই থর মরুতে।
44

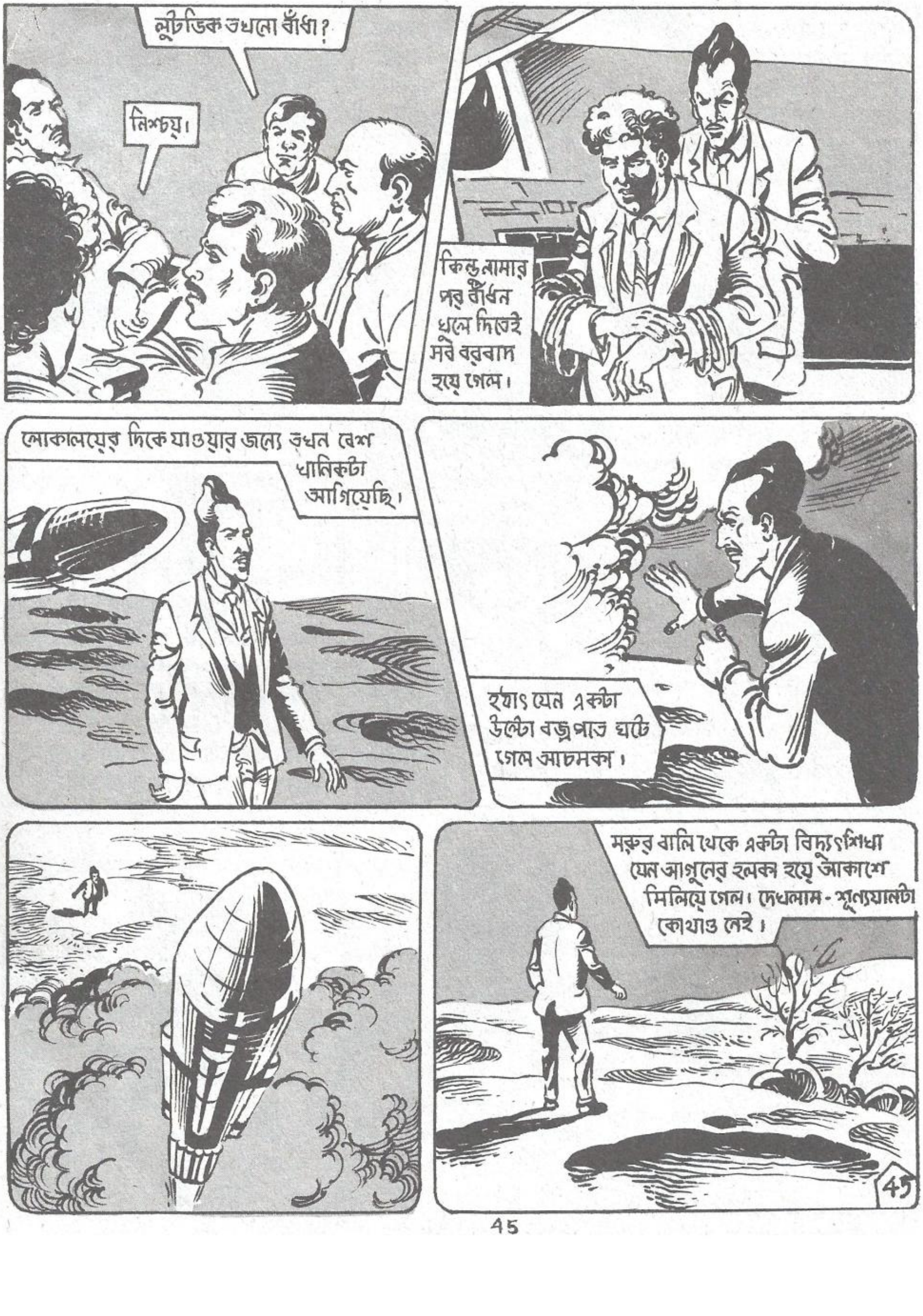
লুটভিক তখনো বাঁধা?
নিশ্চয়।
কিন্তু নামার পর বাঁধন খুলে দিতেই সব বরবাদ হয়ে গেল।
লোকালয়ের দিকে যাওয়ার জন্যে তখন বেশ খানিকটা আগিয়েছি।
হঠাৎ যেন একটা উল্টো বজ্রপাত ঘটে গেল আচমকা।
মরুর বালি থেকে একটা বিদ্যুৎশিখা যেন আগুনের হলকা হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল। দেখলাম - শূন্যযানটা কোথাও নেই।
45

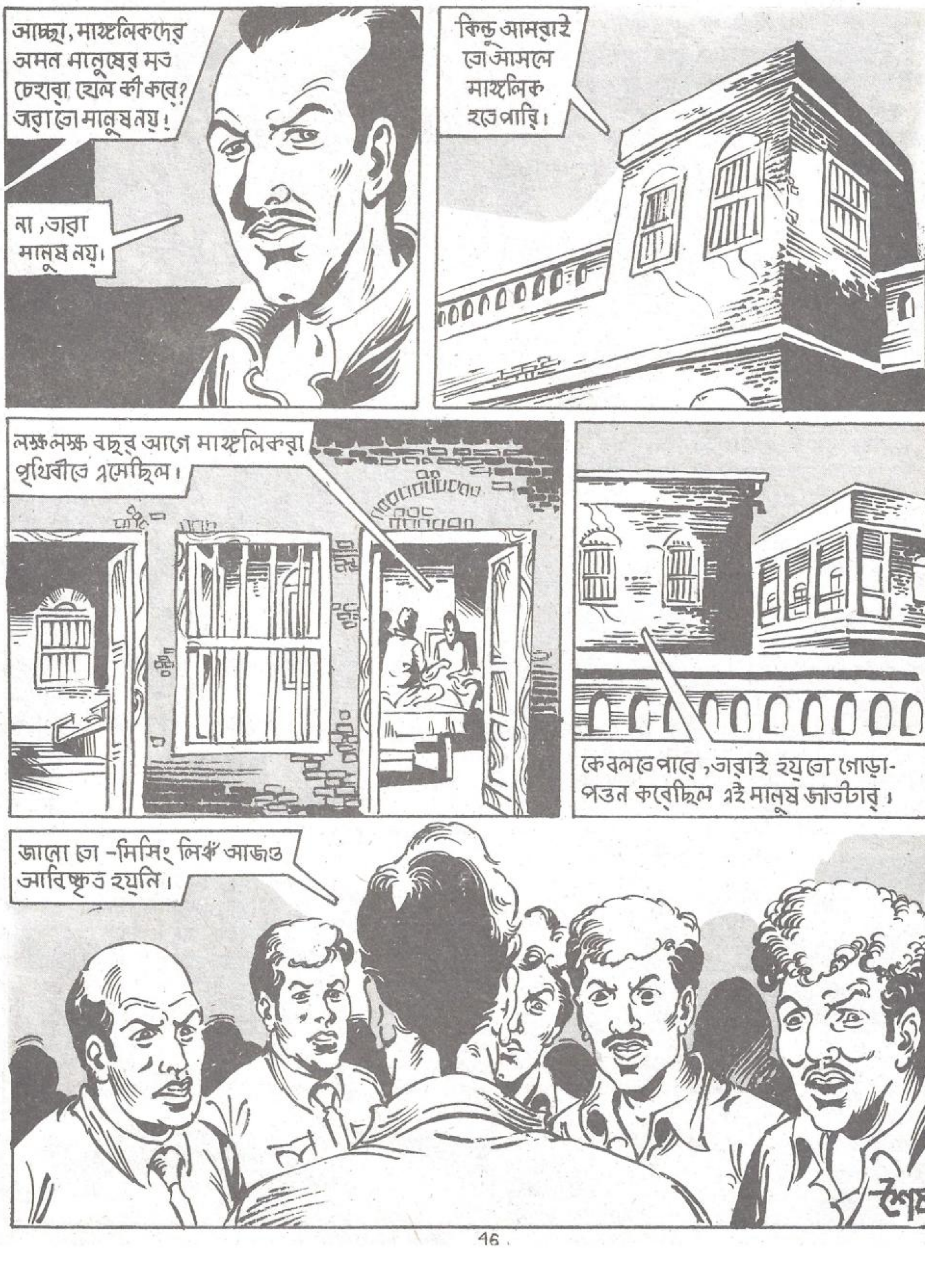
আচ্ছা, মাঙ্গলিকদের অমন মানুষের মত চেহারা হোল কী করে? ওরা তো মানুষ নয়!
না, তারা মানুষ নয়।
কিন্তু আমরাই তো আসলে মাঙ্গলিক হতে পারি।
লক্ষলক্ষ বছর আগে মাঙ্গলিকরা পৃথিবীতে এসেছিল।
কে বলতে পারে, তারাই হয়তো গোড়া-পত্তন করেছিল এই মানুষ জাতটার।
জানো তো -মিসিং লিঙ্ক আজও আবিষ্কৃত হয়নি।
শেষ

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

পোকা

সুব্রত সেনগুপ্ত

বলতে গেলে চোখের সামনে একটা ছেলে উধাও হয়ে গেল। কোথায় গেল পল্টু? তাকে শেষ দেখেছে সৈকত। সৈকতকে সে জিজ্ঞেস করেছে, বালক সঙ্ঘের সঙ্গে আমাদের ম্যাচ কবেরে?—সৈকত বলেছে, পরশু।—ব্যাস, আর কোনও কথা হয়নি। তারপর খেলার মাঠ থেকে যে যার বাড়ি চলে এসেছে। শুধু ফেরার পথে অংশু জিজ্ঞেস করেছে, পল্টুটা কোথায় গেলরে? দরকার ছিল ওর সঙ্গে।—তাইত, কোথায় গেল পল্টু? একজন বলল, বাড়ি চলে গেছে হয়ত।—কিন্তু বাড়ি যায় নি পল্টু। সৈকত পড়তে বসেছে। হঠাৎ অংশুর ডাক শুনে বাইরে বেরিয়ে এল। কি ব্যাপার, না সে পল্টুর বাড়ি গিয়েছিল, ও বাড়ি নেই। ক্লাবে, মন্দিরে আর যেসব জায়গায় পল্টু যেতে পারে সব দেখা হয়েছে, কোথাও নেই। ওর বাড়ির লোক খুব চিন্তা করছে। বলছে, আর কিছুক্ষণ দেখে থানায় খবর দেবে। অংশু জিজ্ঞেস করল, কি করা যায় বলত? দাঁড়া একটু আসছি।—বলে কয়েকটা জিনিস নিয়ে তখনই ফিরে এল। বলল, চল।

অংশু জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবি? সৈকত বলল, চল না। দুজনে পেঁছিল খেলার মাঠে। অংশু বিস্মিত হয়ে বলল, এখানে এলি?—এক দিকে আঙুল দেখিয়ে সৈকত বলল, এখানে ওর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল। অতএব এখান থেকেই তদন্ত শুরু। যতদূর মনে পড়ছে, জলার দিকে ওকে যেতে দেখেছি। পল্টু খুব ভাল সাঁতার জানে। তাছাড়া জলায় অন্তত পল্টু, ডুবে যাবে না। তাহলে জলার ওধারে কি আছে? জঙ্গল। জঙ্গল ঠিক নয় ঝোপঝাড়। সেখানে বাঘ নিশ্চয় নেই—। অংশু বলল. সাপ আছে বা থাকতে পারে।—সাপ থাকলে আর কামড়ালেও কেউ সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় না। পল্টু তাহলে ভয়ে আমাদের কাছে ছুটে আসত, নয়ত বাড়ি যেত। অতএব ছেলেধরা? - ছেলেধরার পাল্লায় পড়ার ছেলে পল্টু নয়। তাহলে বাকি থাকল জঙ্গলের ও পাশের দেয়ালটা। আমার মনে হচ্ছে, পল্টু ঐ দেয়াল কোনরকমে টপকে ওপারে গেছে, গিয়ে বিপদে পড়েছে। আমি ওকে অনেক দিন উঁচু দেয়ালটার সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। একদিন, বাজারের দিকে একটা গেট আছে না, ছোট্টমতো, সেখানে দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি।—অংশু বলল, ঠিক বলেছিস। ও একদিন বলেছিল। ওপারে কি আছে, জানা দরকার। এত উঁচু দেয়াল দিয়ে চারপাশ ঘিরে রেখেছে কেন, আচ্ছা সত্যি কি ব্যাপার বলত, ওটা কারখানা না কি, কি আছে ওখানে? - সৈকত বলল, এখনই জানতে পারবি। আমরা ওখানেই যাব।—দুজনে বহু কষ্টে দেয়ালের ওপরে উঠল। ওপাশে অন্ধকার। শুধু অল্পদূরে একটা দোতলা বাড়ির ওপরের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। বন্ধ কাঁচের জানলা দিয়ে সেই আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু তাতে অন্ধকার একটুও কমেনি। সৈকত পকেট থেকে ছোট একটা টর্চ বের করে জ্বালল। পরিষ্কার কিছু বোঝা যাচ্ছে না। সে চাপা গলায় বলল, সাবধানে নামতে হবে, কাঁটাতার থাকতে পারে। তাতে কারেণ্ট থাকতেও পারে। এই দড়িটার এদিকটা তুই শক্ত করে ধরে থাক। অন্য দিকটা ধরে আমি নামছি। শব্দ করলেই টেনে তুলবি।—সৈকত এক হাতে জ্বলন্ত টর্চ নিয়ে নামতে লাগল। হঠাৎ দেখতে পেল তার পায়ের ঠিক নিচে থৈ থৈ করছে কাদা। আর তারমধ্যে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে শয়ে শয়ে, হাজার হাজার কি পোকা। সৈকতের শরীর শির শির করে উঠল। নিজের

অজান্তে গলা দিয়ে একটা শব্দ বেরিয়ে এল। আর অংশুও সঙ্গে সঙ্গে তাকে ওপরে টেনে তুলল। দুজনে বসে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর দুজনে দেয়ালের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল! কিছুটা যেতে দেখা গেল দেয়াল থেকে কিছুটা দূরে একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু গাছটা এত কাছে নয় যে হাত বাড়িয়ে ডাল ধরা যাবে। সৈকত বলল, হয়ে যাক লং-লাই জাম্পের পরীক্ষা। বলেই শূন্যে লাফ দিল। ডাল ধরতে পারলনা। শব্দ করে মাটিতে পড়ল। গাছের গায়ে মাথা ঠুকে গেল, আর অংশু কোনরকমে একটা ডাল ধরল। কিন্তু ডালটা মড়াৎ করে ভেঙ্গে গেল। সে পড়ল ঠিক সৈকতের পাশে। ঝাঁকুনি সামলে উঠেই সৈকত তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বালল। না এখানে সেই পোকা নেই। কোমর থেকে বার করে একটা ছোট্ট ছুরি হাতে নিল সৈকত, জ্বলন্ত টর্চ তার অন্যহাতে। অংশু ফিস ফিস করে বলল, যদি কুকুর ছাড়া থাকে?—সৈকত বলল, মাইন পাতা থাকলেও অবাক হব না। সাবধানে চল। পা টিপে টিপে দোতলা বাড়িটার সামনে গিয়ে তারা দুজনে দাঁড়াল। দরজা খোলা। পাহারা দিতে কেউ নেই। তবু ওরা সরে গিয়ে বাড়ির পেছন দিকে দাঁড়াল। একটা ঘোরান সিঁড়ি। শব্দ না-করে দুজনে উঠতে লাগল। সিঁড়ির মাথায় একটা ছোট দরজা, আধ ভেজান। সৈকত দরজায় টর্চটা ছোঁয়াল– না, কোথাও সতর্ক করার ঘণ্টা বাজলনা। ভেতরে ঢুকল দু-জনে। ভেতরে মাথায় টুপি, পাইপ মুখে, কাল গগলস চোখে ষণ্ডামতো কেউ বসে নেই। এদিকে পেছন ফিরে টেস্টটিউব হাতে কি যেন করছেন এক বৃদ্ধ। তার মাথার চুল একেবারে সাদা। পরনে একটা লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি। হঠাৎ তিনি পেছন ফিরে দুই মূর্তিকে দেখে চমকে উঠলেন। হাত থেকে টেস্ট টিউবটা পড়ে যেত আর একটু হলে। দুই বন্ধু তার দুপাশে গিয়ে দাঁড়াল। হাতের ছুরি দাঁতে চেপে ধরে সৈকত পকেট থেকে সৈকত পকেট থেকে দড়িটা বার করল। দুজনে মিলে বেঁধে ফেলল বৃদ্ধকে তারপর তাঁকে একটা সোফার ওপর বসিয়ে দিল। সৈকতের রুক্ষগলায় বলল, আমরা কারা তা দিয়ে কোন দরকার নেই। পল্টুকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললে, পল্টু, কে পল্টু? তাকে আমি লুকিয়ে রাখতে যাব কেন?–চারদিকে তাকাতে তাকাতে সৈকত বলল, সেটা জানতেই আমাদের এখানে আসা। ভদ্রলোক হঠাৎ কঠিন গলায় বললেন, আগে আমরা বাঁধন খুলে দাও। নইলে কোন জবাব পাবেনা। —দুই বন্ধুর দিকে তাকাল। তারপর হাতের ছুরিটা শক্ত করে কেপে ধরে সৈকত বলল, খুলে দিচ্ছি। কিন্তু সাবধান কোনরকম চালাকি করার চেষ্টা করবেন না। অংশু বাঁধন খুলে দিতে বৃদ্ধ পকেট থেকে বার করলেন পিস্তল নয়, কতগুলো টফি। জিজ্ঞেস করলেন খাবে?—অংশু বলল, আমাদের বোকা ভেবেছেন? টফি খাই আর ঘুমিয়ে পড়ি আর কি?– ভদ্রলোকের মুখ করুণ হয়ে উঠল। বললেন, তোমাদের আমি ঘুমের ওষুধ দেব কেন? এই দেখ আমি এর মধ্যে একটা তুলে খাচ্ছি? কোনটা খাব বল? এটা, না ওটা, না সেইটা?– অংশু বলল, হলুদটা। না সবুজ—না, লালটা খান। ভদ্রলোক লাল মোড়ক খুলে টফি মুখে পুরলেন। অংশুও সঙ্গে সঙ্গে প্রায় থাবা দিয়ে চারটে টফি তুলে নিয়ে দুটো মুখে পুরল, দুটো পকেটে রাখল। সৈকত তার হাত চেপে ধরে বলল, আমরা এখানে টফি খেতে আসিনি। ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ এবার বলত তোমাদের বন্ধুর কথা কি বলছিলে?–সৈকত বৃদ্ধের মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, পল্টুকে বিকেল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের ধারণা ও এখানে এসেছে। বৃদ্ধ ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু এই ধারণার কারণ?—সৈকত বলল, ওর এ জায়গাটা নিয়ে খুব কৌতুহল ছিল। এখানে কারা থাকে, কি হয়, জানার খুব ইচ্ছে ছিল।—ভদ্রলোক চিন্তিত মুখে বললেন, কী সর্বনাশ ও দেয়াল টপকে ঢোকেনিত?—অংশু বলল, তাই ঢুকেছে।–ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চল চল, দেখি ত? সৈকত অংশুকে চোখের ইশারা করে বলল, আপনি আগে আগে চলুন।—তিনি বললেন, তাই চল।— নামতে নামতে ভদ্রলোক ডাকতে লাগলেন, ওরে ভজুয়া, গিরিধারী কোথায় গেলি? দুটো আলো নিয়ে আয়। লোক ডাকাডাকি হচ্ছে, মতলব কি, কে জানে? সৈকত তার ছুরিটা বৃদ্ধের পিঠের কাছে রেখে হাঁটতে লাগল। যাদের ডাকা হয়েছিল তারা দুটো পেট্রোম্যাক্স নিয়ে এল। যখন জ্বালান হচ্ছে তখন বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বুঝি ডিটেকটিভ বই খুব পড়? অংশু বলল, আমার চাইতে সৈকত বেশি পড়ে। পল্টুও খুব পড়ে, মানে পড়ত, ভূতের গল্পও। ভদ্রলোক হাসলেন, ভূত-ডাকাত ত সবাই পড়ে। পোকামাকড় নিয়ে কিছু পড়না?– দুজনে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, পোকা? বৃদ্ধ আবার হাসলেন, আমি ওদের দিয়ে চাষ করাই। ট্রাকটর লাগে না, সার প্রায় লাগে না।—সৈকত বলল, দূর পোকা ফসলের ক্ষতি করে। বৃদ্ধ বলে উপকার করে এমন পোকাও ত অনেক আছে। যেমন ধর কেঁচো। সৈকত আঁতকে উঠল, গা ঘিন ঘিন করে উঠল অংশুর। বৃদ্ধ বললেন, আচ্ছা, তোমাদের দেখাচ্ছি। তার আগে পল্টুর খোঁজ নেওয়া দরকার। কিরে গিরিধারী হল?—আলো নিয়ে দুজন এসে দাঁড়াল। সৈকতের হাতে ছুরি দেখে একজন বাপ বলে লাফ দিল। আর একজন কাঁপা কাঁপা গলায়, এসব কি বাবু?—বৃদ্ধ হেঁকে বললেন, আরে ভয় পাসনা। ওরা আমার বন্ধু লোক। পাঁচজন সেই

হঠাৎ চোখে পড়ল ঝোপের কাছে কি একটা নড়ছে

দেয়ালের কাছাকাছি এল। সৈকত আগের গাছ আর ভাঙ্গা ডাল দেখতে পেল। হঠাৎ চোখে পড়ল ঝোপের কাছে কি একটা নড়ছে। সবাই ছুটে গেল। সর্বাঙ্গে কাদা-মাখা একজন কেঁপে কেঁপে উঠছে। তার মাথার চুল, জামা-কাপড়, চোখের পাতা কিছুই আলাদা করে চেনার উপায় নেই। সব কাদায় মাখা আর তার ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছে অসংখ্য পোকা। বৃদ্ধ চিৎকার করে বললেন, গিরি আলোটা রেখে শিগগির দুবালতি জল আর ন্যাকড়া নিয়ে আয়। আনা হল। সেই জল ঢালা হল কাদা-মাখা মূর্তির গায়ে। এইত পল্টু। কি ব্যাপার, কি হয়েছিল? পল্টু শুধু কেঁপে কেঁপে উঠছে। কথা বলতে পারছে না।

পল্টুকে ভাল করে পরিষ্কার করাতে ভজুয়া নিয়ে গেল। গিরিধারী দুধ গরম করতে লাগল। বৃদ্ধ তখন সৈকতদের দেখাচ্ছেন, একটা কাঁচের বাক্সের মধ্যে অসংখ্য কেঁচো ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৃদ্ধ বললেন মাঠে যেগুলো দেখেছ সেগুলোও কেঁচো তবে এর চাইতে বড় বড়গুলি আমি তৈরি করেছি। সৈকত জিজ্ঞেস করল, কিন্তু এগুলি কি কাজে লাগবে?—বৃদ্ধ বললেন, কেঁচোর জন্য জমি আলগা থাকে ফলে মাটির জল-হাওয়া ধরে রাখার ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। তাছাড়া কেঁচো মাটি বা আর যা খায়, খেয়ে যা উগরে দেয় তাতে জমির উর্বরতা আরও বেড়ে যায়। সাধারণ ভাবে জমিতে কেঁচো থাকলেই ফলন অনেক বেড়ে যায়। আমি চেষ্টা করছি এই ক্ষমতা আরও বাড়াতে। আর বড় কেঁচো যেগুলো তৈরি করছি, ঠিকমতো কাজ করলে ট্রাক্টরও লাগবে না। আমার কথা বিশ্বাস না হলে যে কোন ভাল জাতের বাগানে গেলে দেখতে পাবে অসংখ্য কেঁচো ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভালজাতের এক হেক্টর জায়গায় 50 লক্ষ কেঁচো থাকতে পারে।

এদিকে গরম দুধটুধ খেয়ে পল্টু অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। একটু পরেই ওরা বাইরে এল। এবার, অবশ্য, সদর দরজা দিয়ে। অংশু বলল, দূর ভাবলাম দারুণ একটা অ্যাড়ভেঞ্চার হবে···

বিচিত্র সংবাদ

মানুষ কমপিউটার

10000 জন মানুষ 5—6 ঘণ্টা পরিশ্রম করে যে হিসেব নিকেশের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে একালের মাঝারি শক্তিসম্পন্ন এক কম্পিউটার সেই কাজ শেষ করতে পারে 2—4 মিনিটে। সম্প্রতি সেই কম্পিউটারের মতো বিশেষ স্মৃতিধর ও দ্রুত অঙ্ক কষায় দক্ষ এক আশ্চর্য মানুষের খোঁজ পাওয়া গেছে। তাঁর নিবাস সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভাতে। তিনি 'সি. এ. আর. এন.'-এর জনৈক কর্মী। তার নাম উইলেম ক্লেইন। হল্যাণ্ডের ইউট্রেখট শহরে 1974 সালে 10ই এপ্রিল মাত্র 1 মিনিট 43 সেকেণ্ডের মধ্যে ক্লেইন সাহেব মুখে মুখে 133 সংখ্যার উনবিংশতম বর্গমূল (19th root a 133 digit number) বার করে সকলকে অবাক করে দেন।

সূর্যমুখীর ঝাড়

একটা সূর্যমুখী ফুলের ঝাড় কত উঁচু হতে পারে? ইংলণ্ডের এসেক্স কাউণ্টির ফ্রাঙ্ক কেল্যাণ্ড ঘরের দেওয়ালের গায়ে লাগানো একটি চারাকে 23 ফুট $6\frac{1}{2}$ ইঞ্চি পর্যন্ত উঁচু করতে পেরেছেন। এটা বিশ্ব রেকর্ড।

দুষ্প্রাপ্য প্রাণী

সেই সব স্থলচর জীবকেই সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য বলা চলে যাদের স্ত্রী বা পুরুষের একটি মাত্র নমুনা এখন রয়েছে। ঐ রকমের এক প্রাণীর নাম টেনরেক (দাসোগেল কণ্টয়ন নতি)। পূর্ব ম্যালাগাসি (ম্যাডাগাস্কার) থেকে তার একটি মাত্র জ্যান্ত নমুনা এযাবৎ পাওয়া গেছে। এখন সেই মৃত টেনরেকের মডেল প্যারীর মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রিতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

সোমেন কুমার সাহু
যোগদা সৎসঙ্গ পালপাড়া বিদ্যালয়

মিষ্টি গাছ

প্যারাগুয়েতে এক প্রকার সুমিষ্ট বৃক্ষ দেখতে পাওয়া যায়। যার ইংরাজী নাম স্টেভিয়া' (Stevia)। ইহার দেহ নিঃসৃত রস চিনি অপেক্ষা তিনশত গুণ মিষ্ট। ইহার এক ফোঁটা রসে এক কাপ চা, দুধ বা কফি সুমিষ্ট ও সুস্বাদু হয়।

নাগরদোলা গাছ

'মেরিগো রাউণ্ডট্রি বাড়ে' নামক মধ্য আফ্রিকার তৃণভূমিতে এক রকম গাছ দেখা যায়, যে গাছের উপরের অংশ মাঝে ঘোরে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন নাগরদোলা ঘুরছে। তাই তো এই গাছের নাম 'নাগরদোলা গাছ'।

প্রসেনজিৎ প্রামাণিক, কাশীনগর, 24-পরগনা।

আশ্চর্য জ্বালানি

শাকুজা তাকেদা নামে জাপানের এক গবেষক ইউক্যালিপ্টাস গাছের পাতার রস থেকে এক রকম জ্বালানি তেল আবিষ্কার করেছেন। এই নব আবিষ্কৃত জ্বালানি দিয়ে তিনি হাল্কা ট্রাক্টর চালিয়ে এক চমক সৃষ্টি করেন। তাঁর মতে জ্বালানি হিসাবে এই তেল গ্যাসোলিনের চেয়ে উৎকৃষ্ট।

নতুন ক্যামেরা

আমেরিকার ন্যাশলাল ব্যুরো অব স্ট্যাণ্ডার্স এক বিশেষ ধরনের ক্যামেরা আবিষ্কার করেছেন। এই ক্যামেরার বিশেষত্ব এই যে এর সাহায্যে একটি পেনির একাংশে যতটুকু জায়গা থাকে ততটুকু জায়গার মধ্যে একটি বইয়ের সমগ্র অংশের আলোকচিত্র গ্রহণ করা যায়। ইহার সাহায্যে একটি বই-এর পাতার দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ অংশে পাতার সমগ্র বিষয় চিত্রের আলোক চিত্র গ্রহণ করা গেছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই চিত্রকে 1250 গুণ বড় করলে ঐ পাতার লিখিত বিষয়টি সহজেই ধরা পড়ে।

বৃহত্তম পাখি

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি আর্জেন্টাভিস ম্যাগনিফিসেন্স। এর উচ্চতা ছিল 6 ফুট আর ডানা মেলে দৈর্ঘ্য দাঁড়াত 25 ফুট। এরা 8,000,000 বছর আগে পৃথিবীতে বাস করত।

অমর তরফদার, বি. ই. কলেজ, কোয়ার্টার নং D/258
পোঃ বি. গার্ডেন, হাওড়া-3

---

*কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রেরিত যাবতীয় 'বিচিত্র সংবাদ'-এর সংগ্রহ সূত্র উল্লেখ করতে হবে।

সংখ্যা-64

সনৎ কুমার কর

64 সংখ্যাটা সাংঘাতিক। সে গল্পে পরে আসছি। আগে বলি সংখ্যাটা ভারতীয় জনজীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল বা এখনও আছে।

মাত্র 30 বছর আগেও আমাদের কথায় ও চিন্তায় এই সংখ্যাটা জড়িয়ে ছিল। মুদ্রা, ওজন এবং গুনতির কাজে 64 ছিল অপরিহার্য। 4 পয়সায় 1 আনা এবং 16 আনায় টাকা। অর্থাৎ 64 পয়সায় 1 টাকা। মজা হল—এখনও অনেকে চলতি 25 পয়সার মুদ্রাকে চার আনা এবং 50 পয়সার মুদ্রাকে আটা আনা বলে—যদিও ওগুলোতে 4 বা 8 এর নাম গন্ধ নেই।

আগে আবার ঐ 1 পয়সাকে লেখা হত 5 দিয়ে। 5 মানে—5 গণ্ডা কড়ি। কড়ি হল একরকম সামুদ্রিক শামুকের খোলা। চকচকে হলদেটে শাদা কড়ি ছোট-বেলায় আমাদের খুব প্রিয় ছিল। কড়ি ছিল সম্পদ। কড়ি দিয়ে ছিল কতরকম খেলা। যাই হোক ঐ কড়ি দিয়ে কিনলে টাকার দাম হত—$20 \times 4 \times 16 = 1280$।

পয়সা ছিল তামার তৈরি। আকার—বর্তমান নতুন এক-টাকার কাছাকাছি। পরে যুদ্ধের সময় তামা বাঁচাতে আকার ছোট হয়ে আসে এবং একসময় মাঝখানটা ফুটো রাখা হয়—যাকে বলা হত ফুটো পয়সা। আনা ছিল হলদে ও সাদা রঙের। বর্তমান দশ পয়সার (ছোট আকারের) মতো—তবে এ্যালুমিনিয়ামের নয়। হয় পেতলের না হয় অন্য কোন ভারী মিশ্র ধাতুর। টাকা ছিল রুপোর—বেশ বড়সড়। ওজন ছিল 1তোলা—বা ভরি। সিকি ও আধুলি অর্থাৎ 4 আনা ও 8 আনা আনুপাতিক ভাবে ছোট কিন্তু রুপোর। যুদ্ধের সময় রুপো বাঁচাতে নিকেলের সিকি, আধুলি ও টাকার চালু হয়। সেই সময় বাজারে প্রচুর মেকী মুদ্রা এসে গেছল। তাদের সঙ্গে পার্থক্য বোঝবার জন্য দোকানে দোকানে চুম্বক রাখা হত। চুম্বকে আটকালে আসল। তা না হলে নকল। তার মানে অচল।

ওজনের কথা একটু আগে উল্লেখ করেছি। এক টাকার ওজন ছিল 1 ভরি। 80 ভরিতে 1সের। ভরি বা তোলার মাপ ব্যবহার হত সোনা, রুপো এইসব দামী ধাতু ও ওষুধপত্রের ক্ষেত্রে। সাধারণ জিনিস হাটে-বাজারে বিকোত সের হিসাবে। 16 ছটাকে এক সের এবং 4 কাচ্চায় এক ছটাক। অর্থাৎ 64 কাচ্চায় সের। সেই 64 এসে গেল। কাজের সুবিধার জন্য অবশ্য সেরকে ভেঙে

ঠিক টাকার আধুলি—সিকির মতো আধ সের ও এক পোয়া (সিকি সের) করা হয়েছিল এবং সেইমত বাটখারা ছিল। আধ-সের ও এক-পো'য়ার মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ—8 ছটাক ও 4 ছটাক। পড়েনগুলো সবই হত লোহার। কাচ্চাটা পেতলের। গুনতির মাপে এখনও আমাদের দেশে দুটো পণ্য বিক্রি হয়। খড় ও পান। ধান পেকে গেলে কাস্তে দিয়ে গাছের গোড়া কেটে কয়েক দিন জমিতে শুইয়ে রাখা হয়। তারপর বাঁধা হয় আঁটি। দু'বিঘতের মধ্যে যতগুলো ধরে ততগুলোকে দুচারটা খড় দিয়ে এক পাশ ঘেসে বেঁধে ফেলা হয় (ধানের উলটো দিকগুলো)। ধান ঝেড়ে ফেলার পর এরকম একটা আঁটি দিয়ে 19 টাকে বাঁধা হয় একসংগে। একে বলে তড়পা। 4 তড়পা সমান

1 পন। 16 পনে 1 কাহন। তাহলে হিসেব দাঁড়াল—$20 \times 4 \times 16 = 1280$ টা আঁটিতে 1 কাহন। ঠিক

টাকার হিসেবের মতো। 1 কাহন কড়িতে এক টাকা। কাহন মানে 1280।

এবার আসি পানে। পান সাজানো হয় 32টা করে। একে বলে গোছ। 32 হলো 64-র অর্ধেক। 10-এর ধারণা যেমন এসেছে আঙুল থেকে তেমন 32-র ধারণা দাঁত থেকে। এক পাটিতে 16টা দাঁত। দুপাটিতে 32। 32র মত 64 ও 16র গুণিতক।

পানের গোছের পরবর্তী মাপ হল শ'। 3 গোছে শ'। একটু ভুল থেকে যায়—কারণ 32×3=96 টাকে শ ধরা হচ্ছে। পানের বড় বড় গাঁটে এরকম কয়েক শ' পান থাকে। 12 শয় 1পাই। 1পাই মানে 128 কম 1280। একেও 64 দিয়ে ভাগ করা যায়।

আর 64 আছে বিশ্বের সবচেয়ে বুদ্ধির খেলা—দাবায়। দাবায় 64টা ঘর। আড়ে 8, লম্বায় 8। কালো শাদা বদলা বদলি। এই দাবা নিয়ে একটা সাংঘাতিক গল্প আছে। এটা পড়ার পর বুঝবে 64 সংখ্যা-টা সত্যি কত সাংঘাতিক!

দাবা খেলা নাকি আবিষ্কার করেছিল শেষাদ্রি নামে একটা লোক। রাজা শুনে খুশি হয়ে তাকে ডেকে পুরস্কার দিতে চাইলে সে এক দানা গম চায় দাবার প্রথম ঘরের জন্যে। দ্বিতীয় ঘরের জন্যে 2 টো। তৃতীয় ঘরের জন্যে 4টে। এইভাবে প্রতি ঘরের জন্য আগের দুগুণ হয়ে যাবে। 64টা ঘরের জন্য এ রকম হিসাবে গম চাইল শেষাদ্রি। রাজার আদেশে গম গুনে গুনে বস্তায় রাখা হতে লাগল। কিছুক্ষণেই দেখা গেল—এটা একটা লোকের কম্ম নয়। লোক বাড়ল গম গোনার জন্য কিন্তু তাতেই হল না। ডাকতে হল পণ্ডিতদের হিসাব করে দেওয়ার জন্যে।

বিকালে রাজা যখন জানতে পারল গম তখনও পাঠান হয়নি, রেগে কাঁই হয়ে গেল। সকলকে ডেকে খুব বকাবকি করে সন্ধ্যার মধ্যে কাজ মিটিয়ে ফেলতে বলল। পণ্ডিতরা কিন্তু মাথা চুলকে জানাল সারারাত লাগবে হিসেব করতে। অগত্যা তাই মেনে নিয়ে রাজা ঘুমুতে গেল।

পরের দিন সকালে গমের ভাণ্ডারী ও পণ্ডিতরা এসে রাজাকে শুকনো মুখে জানাল যে এএক অসম্ভব ব্যাপার। এত গম দেওয়া সম্ভব নয়। রাজ্যে কেন পৃথিবীতে এত গম নেই। আর এত গম একজন কেন সারা রাজ্য এমন কি পৃথিবীর লোক গুনে শেষ করতে পারবে না তাদের জীবদ্দশায়! রাজার মুখ হাঁ হয়ে গেল। পণ্ডিতরা জানাল যে গমের সংখ্যা হচ্ছে—1,84,467,440,7,370, 9551,615। কথায় বললে দাঁড়ায়, একলক্ষ চুরাশি হাজার চার শ' সাতষট্টি কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ সাত হাজার তিনশ' সত্তর কোটি পঁচানব্বই লক্ষ একান্ন হাজার ছ'শ' পনের। পৃথিবীর সমস্ত নদীনালা সমুদ্র শুকিয়ে, পাহাড় ভেঙে সমতল বানিয়ে চাষ করলেও এতগম হওয়া সম্ভব নয়। যদি একটা গোলা বানানো যায় 15 হাত লম্বা ও 10 হাত চওড়া। এই গমের অর্ধেক রাখতে তা উঁচু করতে হবে সূর্য পর্যন্ত।

আর সময়? ধরা যাক একদানা গম গুনতে লাগে 1 সেকেণ্ড সময়। তাহলে একটা লোকের দিনে গোনা হবে 60×60×24=86,400টা দানা। মাসে 25 লক্ষ 92 হাজার। বছরে 3 কোটি 15 লক্ষর মতো। এখন এ দিয়ে আগের রাশিটাকে ভাগ করলে ভাগফল দাঁড়ায়—কিছু কম 60 হাজার কোটি বছর। কোন মানুষ এত দিন বাঁচে? ভারতের পুরো 60 কোটি লোককে (10 কোটি 5 বছরের নিচে। তাই তাদের বাস দেওয়া হল) কাজে লাগিয়ে দিলেও লাগবে হাজার বছর!

তাছাড়া মানুষের ভুল ত্রুটি হতে পারে। সেগুলো শুধরে নিলে আরও সময় বেশি লাগবে। এই সময়টাই কম করে 4 হাজার কোটি বছর হবে? অর্থাৎ ঘুরে ফিরে সেই 64। গম গোনা শেষ হতে লাগবে 64 হাজার কোটি বছর। তখন কোথায় রাজা শ্রীরাম আর কোথায় বা শেষাদ্রি?

সাঁকরাইল, হাওড়া-711313

মজার ইলেকট্রনিক্স প্রোজেক্ট

পার্থসারথি চক্রবর্তী

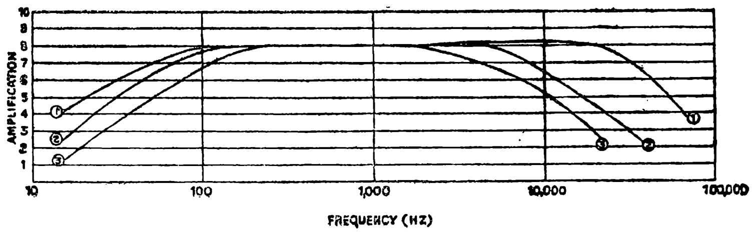

রেকর্ড প্লেয়ারের খসখস শব্দ ফিল্টার

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে লিখেছেন—'বান্ধবীকে গান শোনাতে ডাকতে হয় সতীশকে – হৃদয়খানা ঘুরে মরে গ্রামোফোনের ডিস্‌কে।' গ্রামোফোনের ডিসকে হৃদয়খানা ঘুরে ফিরে বেড়াক তাতে আর আপত্তি কিসের কিন্তু সেই সাধের গ্রামোফোন থেকে অনবরত যদি খসখস আওয়াজ হয়, তাহলে আর যাই হোক গানের সুরের আসনখানি পাতা থাকলেও তাতে নিশ্চিন্তে বসা যায় না। আজকাল অবশ্য 'সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামোফোন' এখন আর নেই। তার জায়গা জুড়ে বসেছে নামীদামী সব রেকর্ড প্লেয়ার। কিন্তু রেকর্ড প্লেয়ার যখন চলে তখন পুরনো রেকর্ডের বৃত্তাকার খাঁজকাটা অংশে (গ্রুভ) প্রায়ই ময়লা জমে একটা খসখসে 'আওয়াজ' বেরোতে থাকে। এটা শুনতে ভাল লাগে না মোটেই—রেকর্ড প্লেয়ারের হ্যাণ্ডেলের (Stylus) অনিয়মিত গতিবিধির জন্য একটা ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়, তার ফলেই এই আওয়াজ শোনা যায়। একে ইংরাজীতে বলা হয় Scratch; এর ফ্রিকোয়েন্সি হয় সাধারণত 5 থেকে 15 KHz ; এই Scratch-এর শব্দের জন্য রেকর্ড প্লেয়ারের মেকানিজমে আরও একটা শব্দের ঢেউ ওঠে, যার ইংরাজী নাম হল Rumble, ফলে নিচু ফ্রিকোয়েন্সির গোলযোগ দেখা দেয়।

এই দুটো অসুবিধাই দূর করা যায় ফিল্টার করে। তোমরা ভাবছ বুঝি শব্দ আবার ফিল্টার করা যাবে কিভাবে ? জল ও তরল পদার্থই তো ফিল্টার করে নেওয়া যায়। হ্যাঁ, তা যায় সত্যি, কিন্তু তুমি কায়দা করে অপ্রয়োজনীয় শব্দও ফিল্টার করে নিতে পার ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে। এই মজার, ইলেকট্রনিক মডেলটা তৈরি করাও বিশেষ কঠিন নয়।

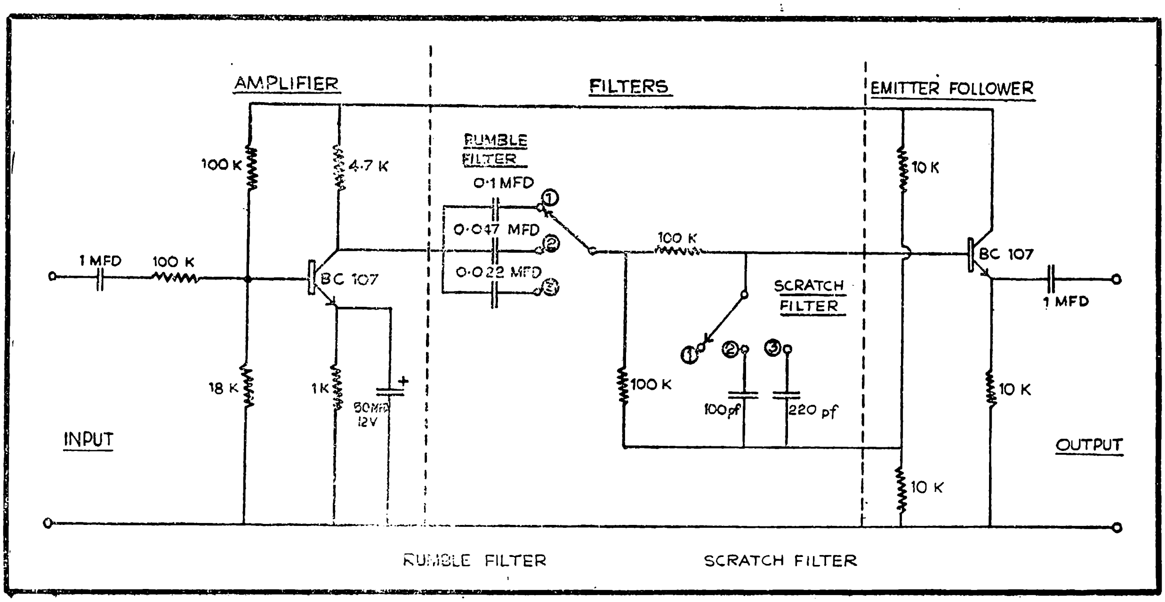

আমাদের সুবিধায় জন্য এস, প্রথমেই মডেলটাকে আমরা তিনটে অংশে ভাগ করে নিই। প্রথম অংশে থাকবে সাধারণ এমিটার এ্যামপ্লিয়ার। দ্বিতীয় অংশ হল ফিল্টার নেট ওয়ার্ক। তৃতীয় অংশ হচ্ছে এমিটার ফলোয়ার।

প্রথম অংশের কাজ হল যে সিগন্যাল ঢুকছে সেটা এ্যামপ্লিফা করা। দ্বিতীয় অংশ কিছু অডিও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডকে রবর্তী ধাপে প্রবেশ করতে সাহায্য করছে। সব শেষের অংশ করাচ্ছে impedence ম্যাচিং।

দ্বিতীয় অংশে প্রথম সিলেক্টর সুইচের Rumble ফ্রিকোয়েন্সির জন্য তিনটে জায়গা আছে। এটা নিচু অডিও ফ্রিকোয়েন্সি আলাদা করতে পারে। সিলেক্টর সুইচের তিনটে জায়গা তিনটে ক্যাপাসিটরের জন্য নির্বাচন করা চলবে। এটা হল 0·1 Mfd, 0·047 Mfd, 0·022 Mfd ; এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে—ক্যাপাসিটরের মান যত বেশি হবে তত বেশি Lower Side অডিও ফ্রিকোয়েন্সি পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করতে পারবে।

দ্বিতীয় সিলেক্টর সুইচ হচ্ছে Scratch ফ্রিকোয়েন্সির জন্য। এটা উঁচু অডিও ফ্রিকোয়েন্সিকে আলাদা করতে পারে। এখানে ক্যাপাসিটরের মান যত কম হবে তত বেশি higher ফ্রিকোয়েন্সি প্রবেশ করতে পারবে। সুইচের প্রথম জায়গার সঙ্গে ক্যাপাসিটরের সংযোগ নেই। দ্বিতীয় জায়গায় সংযোগ করছে 1000 pf এবং তৃতীয় জায়গায় 220 pf ; গ্রাফ ও চার্ট থেকে কিভাবে ইউনিটগুলি অডিও ফ্রিকোয়েন্সিকে আলাদা করছে তা বুঝতে পারবে।

RUMBLE FILTER

	① 0·1 MFD	② 0·047 MFD	③ 0·022 MFD
15 Hz	4	2·5	1·5
25 Hz	5·6	4	2·5
50 Hz	7	6·4	5
100 Hz	8	7·5	6·8
250 Hz	8	8	8
1000 Hz	8	8	8

SCRATCH FILTER

	① —	② 100 Pf	③ 220 Pf
1 KHz	8	8	8
5 KHz	8	8	7
10 KHz	8	6·5	5
15 KHz	8	5	3·5
20 KHz	8	4	2·5
50 KHz	5	1·5	—

কি কি জিনিস জোগাড় করতে হবে

ট্রানজিসটর Bc 107 দুটো ; রেজিসটর (সব ½ ওয়াট) 100k চারটে ; 10k 3 ; 18k 1 ; 4·7k 1 ; এবং 1k 1 ; কনডেনসার—ইলেকট্রোলাইটিক, 50 Mfd 12 v ; Paper অথবা Polyster ঃ 1Mfd দুটো ; 0·1 Mfd একটা ; 0 047 Mfd একটা এবং 0·022 Mfd একটা ; সিরামিক বা মাইকা ঃ 100 Pf একটা ; 220 pt, একটা ; রেজিসটর ঃ 100k—চারটে ; 18k—একটা ; 1k—একটা ; 10k—তিনটে ; 4·7k—একটা 1 এছাড়া লাগবে গ্রুপ বোর্ড, সলডার, তার, স্ক্রু, তার—এই সব।

আর. এইচ. এস. নিউ আলিপুর (সাহাপুর) ব্লক এন. ফ্ল্যাট-7, কলি-700038

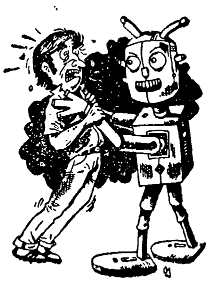

বিউমনশিয়া

বিউমনশিয়া লতানে ফুল গাছের মধ্যে অন্যতম। এই ফুলগাছটি লতানে গুল্ম, সাধারণতঃ খুব লম্বা উচুঁ গাছের ওপর বৃহদাকারে বিস্তৃতি লাভ করতে দেখা যায়। পাতাগুলি খুব বড় বড় চিরসবুজ, পত্রবিন্যাস অভিমুখ হয়। মার্চ-এপ্রিল মাসে ঘন্টাকৃতি সাদা সাদা ফুলে ভরে ওঠে। শীতকালে ফল হয়।

বিউমনশিয়া

এই ফুলগাছটির কেতাবী নাম বিউমনশিয়া গ্রানডিফ্লোরা। ল্যাটিন ভাষায় এই গ্রানডিফ্লোরা কথার অর্থ বড় ফুল। নেপালী ভাষায় বারবারি বলা হয়। এপোসাইনেসী গোত্রের অন্তর্গত। আদি বাসস্থান ভারতের পূর্বাঞ্চল হিমালয়।

এই ফুলগাছটির কাণ্ড কাষ্ঠল হয় এবং কান্ডটির যেকোন অংশ কাটলে বা ভাঙলে প্রচুর পরিমাণে দুধের মত রস বার হতে দেখা যায়। এর কারণ তরুক্ষীর নালীর উপস্থিতি।

পুষ্পবিন্যাস নিয়ত অর্থাৎ সাইম। প্রথমেই বলেছি ফুলগুলি ঘন্টাকৃতি হয়। নিচের দিকে নলাকার অংশ হ্রস্ব হয় অতঃপর পাঁচটি বড় বড় গোলাকার পাঁপড়িতে বিভক্ত হয়। লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা হয়। পাঁপড়িগুলি ধবধবে সাদা হয় কিন্তু ফুলের নিচের অংশে সবুজ ভাব থাকে। পুংস্তবক পাঁচটি হয়। পুংদণ্ডগুলি ছোট হয়। দেখে মনে হবে পাঁপড়িগুলির দেওয়াল থেকে উদ্ভুত হয়েছে। একে ইংরাজীতে এপিপেটালাস স্ট্যামেন বলা হয়। এই এপিপেটালাস স্ট্যামেন এপোসাইনেসী গোত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরাগধানীর আকৃতি বানাকার অর্থাৎ তীরের ফলার মত হয়। ইংরাজীতে একে স্যাজিটেট বলে। লম্বায় প্রায় 0·5—0·7 ইঞ্চি হয়। স্ত্রীস্তবকে গর্ভমুণ্ড পাঁচকোনা হয়।

এই ফুলগাছটির বৃদ্ধি বীজ ও কাটিং দ্বারা হয়।

এই ফুলগাছটির ব্যবহারিক প্রয়োগও বর্তমান। তরুন শাখা থেকে মোটা দঁড়ি প্রস্তুত হয়।

এণাক্ষী বিশ্বাস

বেলুন ওড়ে কেমন করে

সকালবেলা লিখতে বসেছি। জিজা এল, কাঁদতে কাঁদতে। বেলুনওয়ালার কাছ থেকে একটা নীল বেলুন কিনেছিল। দিদি সেটা ফাটিয়ে দিয়েছে—তাই কান্না। বললুম 'না, এ দিদির ভারি অন্যায়', প্রতিজ্ঞা করতে হল দিদিকে কোনদিন কিছু কিনে দেবনা। এবং জিজাকে পরদিনই একটা আরো ভালো বেলুন কিনে দেব। তবু কান্না থামেনা।

তখন বললুম 'গল্প শুনবে'। জিজার কান্নার ওষুধ এতদিনে আমার জানা হয়ে গেছে। ওষুধে কাজ হল, তড়িঘড়ি চোখ মুছে জিজা বলল, কিসের গল্প, কাকু?

'বেলুনের, বেলুন কি করে প্রথম আবিষ্কার হল, জানো?'

'না বল।' অমনি কান্না হাওয়া, মোড়া টেনে জিজা একদম আমার পাশটিতে।

'জোসেফ মণ্টগোল্ফায়ার আর জ্যাক মণ্টগোল্ফায়ার বলে দুই ভাই ছিলেন। তাঁরাই প্রথম বেলুন তৈরী করেন। অনেক চিন্তা করে দুভাই বের করলেন যে একটা ব্যাগে যদি গরম হাওয়া ভর্তি করা যায় তাহলে সেটা বাতাসে ভাসতে পারে। এইভাবে প্রথম বেলুন তৈরী হল। আড়াআড়িভাবে 10 ফিট চওড়া, কাপড়ে তৈরী ভেতরে কাগজের লাইনিং দেওয়া আর চমৎকার রঙ করা। প্রথম উড়ল বেলুন 1783র 5ই জুন। তিনটি যাত্রী নিয়ে।

'আমি জানি কে কে' জিজা চেঁচিয়ে উঠল, জোসেফ জ্যাক আর ওদের কাকু।'

'না। একটা হাঁস একটা মোরগ আর একটা ভেড়া, সবাই ভেবেছিল সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটবে, কিন্তু বেলুন যখন মাটিতে এসে পৌঁছল, দেখা গেল আর সব ঠিকঠাক, কেবল মোরগটা আর ভেড়াটা নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করে জখম হয়েছে।

'কিন্তু বেলুনটা উড়ল কি করে?

'ওই যে বললাম, হাওয়ার থেকেও হাল্কা কোন গ্যাসে যদি একটা ব্যাগ ভর্তি করা যায়, তখন সেটা বাতাসে ভাসে। জোসেফ আর জ্যাক দেখল যে বাতাসকে গরম করলে সেটা সাধারণ বাতাসের থেকে হাল্কা হয়ে যায়। তাই বেলুনের তলায় একটা ছোট আগুনের চুল্লী বেধে দিলে তারা আরও পরে। গ্যাস বেলুন আবিষ্কার হ'ল। তাতে বাতাসের থেকে হাল্কা গ্যাস হিলিয়াম ভরে দেওয়া দেওয়া হত। এই বেলুনগুলোর তলায় বালির বস্তা বাঁধা থাকত, তার কয়েকটা কমিয়ে দিলেই বেলুন অমনি উপরে উঠত, আর হাওয়া কিছুটা বের করে দিলেই বেলুন ভেসে আসত।

অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ

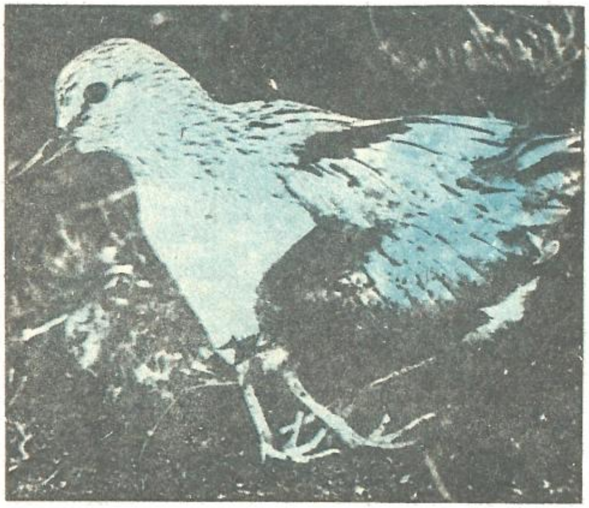

কুশিয়া বালুবাটান

বছর তিনেক আগে একটি বালুবাটানকে (স্যান্ড-পাইপার) প্রথম দেখেছিলাম সুন্দরবনে। সেটি হয় গুলি খেয়ে না হয় অন্য কোনো কারণে আহত হয়েছিল। তার পা বাঁকা ও আঙুল উলটানো ছিল।

গত 23শে জানুয়ারি '86 তারিখে বিজয়নগরে যেতে দেখেছিলাম কম করে দশ-পনেরটা। ফাঁক ফাঁক হয়ে জলের ধারে কাদার উপর চরছিল। এক-একটা কাদার ভিতর থেকে কোনো খাদ্যবস্তু তুলে নিয়ে দুর্গা-দোয়ানির জলে চঞ্চু ডুবিয়ে কাদা পরিষ্কার করে গলাধঃকরণ করছিল। সবচেয়ে যেটি আশ্চর্যের সেটি এদের চঞ্চু, সেটি সোজা বা নিচের দিকে বাঁকানো নয় উপরদিকে উলটানো।

এদের নাম—কুশিয়া বালুবাটান, টেরেক বালুবাটান (ট্রিংগা টেরেক), ইংরেজি—অ্যাভোসেট স্যান্ডপাইপার, টেরেক স্যান্ডপাইপার। নীররঙ্ক গণের (ট্রিংগা) এক প্রজাতি। লম্বায় 24 সেমি (সাড়ে 9 ইঞ্চি)। প্রায় 49 মিমি সরু লম্বা চঞ্চু উপর দিকে অল্প বাঁকানো এবং বেঁটে কমলা-হলুদ পা দূর থেকে চিনিয়ে দেয়। উড়ন্ত অবস্থায় দেখা যায় ফিকে ছাই-পাটকিলে বস্তিপ্রদেশ এবং লম্বাটে কালো ডানার ধার বেশ প্রকট।

শীতকালে উপরটা ছাই-পাটকিলে, কপাল ও অংসফলক সাদা। নিচটা পুরোপুরি সাদা। গ্রীষ্মে বা প্রজনন-কালে কালো 'V'-এর মতো দাগ পিঠে। মাথা, গলার ধারে এবং বুকে পাটকিলের অনেকগুলি ছোটো টান। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু কালো এবং গাঢ় পাটকিলে গোড়াটা হলদেটে-কমলা। পা ও আঙ্গুল ময়লাটে হলদে থেকে উজ্জ্বল কমলা-হলুদ। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান—উত্তর রাশিয়া থেকে সাইবেরিয়া, পূবে কলাইমা নদী, দক্ষিণে উরাল থেকে বৈকাল হ্রদ বা তারও কিছু পূবে। শীতে পরিযায়ী হয় পূর্ব আফ্রিকা, মালাগাসিয়া, মরিশাস, ভারত, বর্মা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া ও তাসমানিয়া। ভারতে আগস্টের গোড়ায় পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের মাকরান থেকে কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের (সৌরাষ্ট্র) সমুদ্র উপকূল থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত, সেখান থেকে পূর্ব উপকুল ধরে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, সেখান থেকে শ্রীলঙ্কার উত্তরপশ্চিম উপকূল। দেখা যায় সমুদ্রের ধার, গরান-বাইনের জলা, জোয়ার ভাটা বেলা খাঁড়িমুখ ও সমুদ্রের উপকুলে উপহ্রদে। ক্বচিৎ দেখা যায় সমুদ্রের ধার থেকে একটু ভিতরে মিষ্টি জলের জলায় বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বড়ো বড়ো নদী যেখানে সমুদ্রে পড়ছে দেখা যায় তার তটভূমিতে জোড়ায় বা 13-14র ছোট দলে তাদের খাদ্য ছোটো কম্বোজ, করচী ও পোকামাকড় সংগ্রহ করতে।

অজয় হোম

জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট

মান ঃ VI/VII/VIII শ্রেণী মে' 1986

1. আর্য ঋষিদের সৃষ্ট সাহিত্যের নাম কি ?
2. পাকস্থলী ও অন্ত্র আবরণী কলা থেকে কোন্ রস ক্ষরিত হয় ?
3. 'স্পাইরোগাইরা' উদ্ভিদ না প্রাণী ?
5. সাঁচীস্তূপ কার আমলে নির্মিত হয়েছিল ?
6. পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মালদহ—মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে প্রাচীন বাংলার কোন্ রাজ্য অবস্থিত ছিল ?
7. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কতো খ্রীস্টাব্দে শুরু হয় ?
8. দুটি তরল মৌলিক পদার্থের নাম বলতে পার কি ?
9. 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থটি কে রচনা করেছিলেন ?
11. 'তিলপাড়া বাঁধ' কোন্ নদীর উপর নির্মিত হয়েছে ?
12. ফুটবল খেলার মাঠে একটি গোলপোস্টের উচ্চতা এফ. পি. এস. এককে কতো ?

মার্চ '85তে প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট 'এর সমাধান

1. জি, শঙ্কর কুরূপ 2. 1221 সালে 3. সৌদি আরবের জেড্ডায় 4. রবিশস্য ডালকে 5. ক্রিকেট 6. Ovis 7. অভ্র 8. তিরিশটি 9. ইগ্লু 10. মধ্যপ্রদেশ 11. স্যার সৈয়দ আমেদ 12. ভিটামিন D

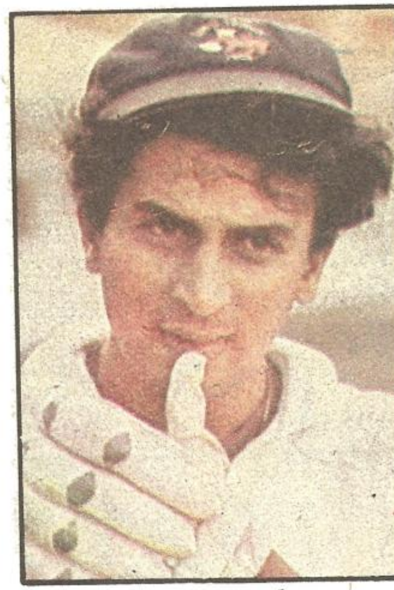

4. এঁকে চেন কি ?

ফোটো ক্যুইজ

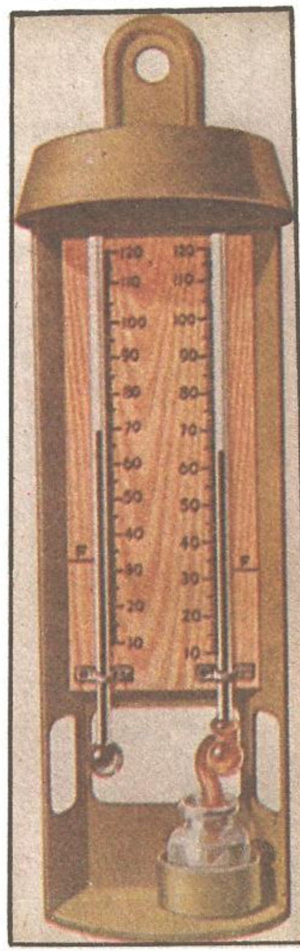

10. এই যন্ত্রটির নাম কি ?

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় ● জয়ন্ত দত্ত

মার্চ '86 সংখ্যার ক্যুইজ-কনটেস্ট প্রতিযোগিতায় সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হলো : দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রযত্নে—কেয়া বন্দ্যোপাধ্যায় E-4/1, করুণাময়ী হাউসিং এস্টেট, সল্টলেক, কলকাতা-700091.

মার্চ '86 সংখ্যার ক্যুইজ-কনটেস্ট প্রতিযোগিতায় দশ বা তার বেশি প্রশ্নের সঠিক উত্তর-দাতাদের নাম :

কলকাতা : যীশু ভট্টাচার্য, শৈবাল দে, দেবাংশু দাস, শুভব্রত মণ্ডল, শশাঙ্ক রঞ্জন ভুঁইয়া।

24-পরগনা : সঞ্জিতকুমার দত্ত, তুষারকান্তি হীরা, প্রদীপকুমার ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ।

উত্তর চব্বিশ পরগনা : অনুকূলচন্দ্র পাল, অর্ণব রায়, শান্তনু মণ্ডল, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস।

হুগলী : মনজিৎ দত্ত।

বর্ধমান : অরূপরতন দাস, দেবজ্যোতি পাণি, কৌশিক সাহা, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়।

পুরুলিয়া : শুভদীপ নন্দী।

কোচবিহার : প্রলয়কান্তি ডাকুয়া, তন্ময় চক্রবর্তী।

মার্চ '86 এর আই-কিউ-টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদানের জন্য (আগে আসার ভিত্তিতে) যে পাঁচজন সার্টিফিকেটের জন্য নির্বাচিত হয়েছে :

1. তহসিনা খাতুন, প্রযত্নে—হাজী শেক মুরশেদুল ইসলাম 42/1B, সামশুল হুদা রোড, কলকাতা-700017.
2. জয়ন্ত তলাপাত্র, প্রযত্নে—রবীন্দ্রচন্দ্র তলাপাত্র, কোয়ার্টার নং-994/215, ডাকঘর—কল্লা, আসানসোল, জেলা-বর্ধমান।
3. ইন্দ্রজিৎ সান্যাল, কোয়ার্টার নং-3/M/3 ইউনিট-4, ওল্ড সেটেলমেণ্ট, খড়্গপুর-721301.
4. দিলীপকুমার ঘোষ, গ্রাম—নেকড়ে, ডাকঘর—নেকড়ে, জেলা—পুরুলিয়া।
5. সৌমিত দাস, প্রযত্নে—সত্যেন্দ্রনাথ দাস, চকভবানী, ডাকঘর—বালুরঘাট, জেলা—পশ্চিমদিনাজপুর, পিন—733101.

আই-কিউ-টেস্ট মার্চ '86-এর সমাধান

1. ফেরিওয়ালা, কারণ অন্যগুলি লেখাপড়ার সঙ্গে যুক্ত।
2. সরোজিনী নাইডু।
3. (b) 80 গ্রাম।
4. (b) ল্যাকটিক অ্যাসিড।
5. (d) $\frac{1}{\sqrt{7}}$

আইকিউ টেস্ট, ক্যুইজ-কনটেস্ট ও ফোটো ক্যুইজ-এর প্রতিযোগীদের প্রতি

ক্যুইজ কনটেস্ট ও আই কিউ টেস্ট এর উত্তরের সঙ্গে অনেকেই নির্দেশ অনুযায়ী শিরোনামটি কেটে পাঠাচ্ছ না। তাই অনেকের উত্তরপত্রই বিবেচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। মে সংখ্যায় আই কিউ টেস্ট, সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট ও ফটো ক্যুইজের প্রতিযোগীদের জন্য আলাদা স্লিপ ছাপা হয়েছে। উত্তরের সঙ্গে অবশ্যই স্লিপটি পূরণ করে কেটে পাঠাতে হবে। এবং পোস্ট-কার্ড বা খামের উপরে পরিষ্কার করে লিখতে হবে প্রতিযোগিতার নাম।

মডেল ও শব্দকূট প্রতিযোগিতার ফলাফল

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়োজিত শব্দকূট, 1985-86 প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশিত হলো।

বিচারকমণ্ডলীর সুপারিশক্রমে নির্বাচিত প্রথম তিনজনের নাম ঃ

প্রথম ঃ সুজিত ঘোষ, প্রযত্নে—সত্যগোপাল ঘোষ কলুপুকুর রোড পোঃ চন্দননগর, জেলা ঃ হুগলী।

দ্বিতীয় ঃ বিকাশ চন্দ প্রযত্নে—বিনয়কুমার চন্দ নিউ-কলোনী, কোঃ নং E-11, স্ট্রীট-15, দুর্গাপুর-7, বর্ধমান।

তৃতীয় ঃ সুব্রত চৌধুরী 138, কে. এস. রোড নৈহাটী 24-পরগনা—743165

বিঃ দ্রঃ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, মে'র শেষ অথবা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার অর্পণ করা হবে। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত মডেল নির্মাতাদের এবং শব্দকূট রচনায় সফল প্রতিযোগীদের তাদের সঠিক নাম ঠিকানা জানিয়ে দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

মে'র শেষ অথবা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য একটি অনুষ্ঠানে মডেলগুলি নির্মাতাদের প্রদর্শন করতে হবে। এবং চূড়ান্তসিদ্ধান্ত বিচারকমণ্ডলী গ্রহণ করে তিনজনকে নির্বাচিত করবেন।

প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত মডেলগুলির নাম ও তাদের নির্মাতাদের ঠিকানা নিচে দেওয়া হলো ঃ

1. মিউজিক্যাল খেলনা ঃ অভিজিৎ মিত্র, 'সুভাষ ভবন', রায়গর, বাঁশদ্রোণী, 24-পরগনা।
2. তৈরি কর নাচুনে আলো ঃ শৌভিক চক্রবর্তী নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল, নবদ্বীপ, নদীয়া।
3. এলিমিনেটর ঃ দিব্যেন্দু ভৌমিক, সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দির, 24-পরগনা।
4. ইলেট্রনিক্স প্লে ঃ বিপ্লবকুমার ভট্টাচার্য, বেলঘরিয়া, উদয়পুর, কলকাতা-700049
5. দোলনা ঃ রাজীব সাধু, চৌমাথা, চুঁচুড়া, হুগলী
6. লাইট মিউজিক ঃ কুন্তল অধিকারী, শান্তিনগর, বেঙ্গল এনামেল, 24-পরগনা।
7. পিয়ানো সেট নির্মাণ ঃ পঙ্কজ কুমার বসু, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।
8. গোবর থেকে বিদ্যুৎ ঃ সুজনকুমার দাস, 20। এন. এস. রোড, অঞ্জন নগর, শেওড়াফুলি, হুগলী।
9. মর্ডান অ্যানসার ইন্ডিকেটর ঃ কুন্তল পাল, প্রযত্নে—ডি. ডি. পাল, ড্রইং অ্যান্ড ডিজাইন আটো প্ল্যাণ্ট—III TELCO, জামসেদপুর-10 (অফিস ERCI) বিহার।
10. ইলেকট্রনিক ডোর বেল ঃ মনোজ দাস, গ্রাম+ডাকঘর—রঘুদেবপুর, জেলা—হাওড়া।

শব্দকূট / উজ্জ্বল আচার্য

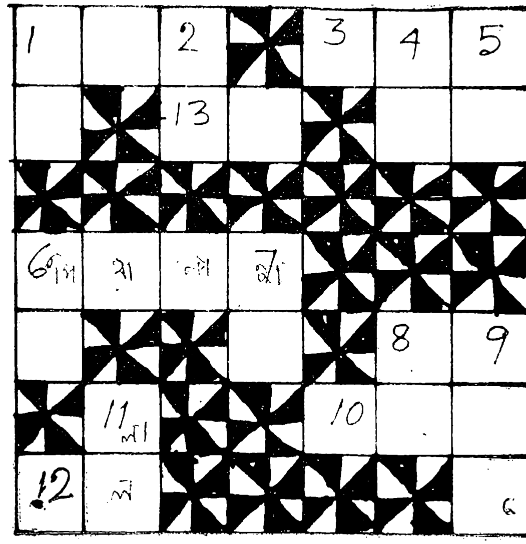

সূত্র ঃ—

পাশাপাশি-ইংরেজ বিজ্ঞানী র‍্যামজে এবং ট্রেভারস্ যে গ্যাস আবিষ্কার করেন।

3. যে উদ্ভিদের ফলকের তল আঠালো হয়।
6. মানুষ খেকো মাছের নাম।
8. রক্তের যে অংশ থেকে বিলিরুভিন ও বিলিভার্ডিন উৎপন্ন হয়।
10. ক্ষীরকোষ গঠিত হয় এমন একটি উদ্ভিদ।
12. অভিকর্ষ ক্ষেত্রে বিভবের একক।
13. যাহার মাধ্যমে প্রতিকোষে অক্সিজেন পেঁছয়।

উপর-নিচ ঃ-1. যে গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজলে মুখের ক্যানসার প্রতিরোধ করা যায়।

2. পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নত প্রাণী।
4. সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন জীব।
5. যে ফলের বৈজ্ঞানিক নাম 'Musa Sapientum.'
9. যাহাকে ঋণাত্মক ত্বরণ বলা হয়।
11. ধমনীর রক্তের রং '—'।
7. ভারতীয় যে প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম 'Elephersin-dicus'.
6. '—' রস ক্ষারজাতীয় বলিয়া পরিপাকে অংশগ্রহণ করে না।

c/o জীবনানন্দ আচার্য, পোঃ দিনহাটা; কোচবিহার।

নিজে নিজে কর

অদৃশ্য প্রহরী মেহবুল ইসলাম

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

1. ট্রানজিস্টার ঃ—TR_1—AC 125
   TR_2—AC 128
2. রেজিস্ট্যান্স ঃ—R_1—1K $\frac{1}{4}$w
3. L.D.R. (Light Depended Resistance)
4. ভেরিয়েবল রেজিস্টান্স
5. রিলে—100Ω—6VDC—SPDT
6. ইলেকট্রিক বেল
7. ইলেকট্রিক বাল্ব

এছাড়া লাগবে কিছু তার ও চারিটি ব্যাটারী।

এগুলি চাঁদনী মার্কেটের যে কোন ইলেকট্রনিক পার্টসের দোকানে পাওয়া যাবে।

এইবার চিত্রানুযায়ী সমস্ত কানেকশান সম্পূর্ণ কর। সার্কিট অনুযায়ী কানেকশান করার সময় ট্রানজিস্টারের এমিটার, বেস ও কালেক্টারের ছবির সঙ্গে সঠিকভাবে মিলিয়ে নিয়ে নিয়ে ঝালাই কর। রিলের দুটো পয়েন্টের সঙ্গে কারেন্টের মূল প্রবাহ যোগ কর।

প্রথমে মডেলটাকে এমনভাবে দরজায় লাগিয়ে দাও যাতে L.D.R.টা ঢাকা না পড়ে। এবার একটা 100w-এর জ্বলন্ত বাল্বকে L.D.R-এর উপর এমনভাবে রাখ যাতে L.D.R-এ আলো পড়ে। L.D.R-এ আলো পড়লে সমস্ত কানেকশানটা (ব্যবস্থা) বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে বেল বাজবে না। এবার যদি কোন লোক বাল্ব ও L.D.R-এর মধ্যে দিয়ে যায় তবে তার ছায়া L.D.R-এ পড়বে। ফলে L.D.R সচল হবে। সমস্ত ব্যবস্থাটা সক্রিয় হবে, ফলে ইলেকট্রিক বেল বাজবে। ফলে বোঝা যাবে কোন লোক বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেছে। বস্তুত এটা করবে অন্ধকারে।

এই সার্কিটকে অন্য ভাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। তখন মডেলটার নাম হবে 'অটোমেটিক স্ট্রীট লাইট' বা *'স্বয়ংক্রিয় রাস্তার আলো'।* অর্থাৎ ঐ সার্কিটটাকে লাইট পোস্টের পাশে বসাতে হবে। L.D.Rটাকে খোলা রাখতে হবে যাতে সূর্যের আলো এসে পড়ে L.D.R-এর উপরে।

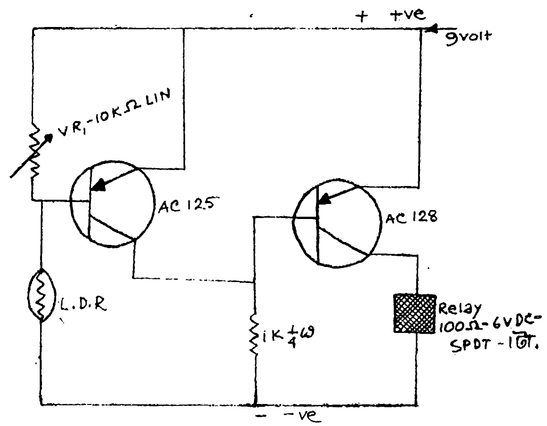

MODEL CIRCUIT

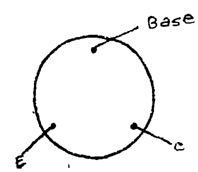

সূর্যের আলো পড়লে L.D.R অচল হবে, ফলে বাল্ব আর জ্বলবে না। কিন্তু রাত্রের অন্ধকার হলে আবার L.D.R সচল হবে, ফলে বাল্ব জ্বলবে। এই ব্যবস্থাকে কাজে লাগালে কারেন্ট অপচয় রোধ হবে।

C/o. আজিজুল ইসলাম, 19, রাজকুমার চক্রবর্তী স্ট্রীট, কলিকাতা-9

জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত

নিজে নিজে কর

তিরিশটি মডেলের সরল সচিত্র নির্মাণ পদ্ধতি।

প্রকাশিত হয়েছে। দাম দশ টাকা। ভি. পি. ১২.০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ। ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

নিজে নিজে কর

'টেষ্টিং বোর্ড' শৌভিক চক্রবর্তী

কোন ইলেকট্রনিক্সের মডেল নির্মাণ অথবা মেরামতির জন্য সোল্ডারিং আয়রন অথবা এলিমিনেটর চালাতে হয়। এই এলিমিনেটর অথবা সোল্ডারিং আয়রন কোন কারণে শর্ট হলে বাড়ির মেইন ফিউজ হয়ে যায়। এই সব সমস্যা নিবারণের জন্য টেস্টিং বোর্ড ব্যবহৃত হয়ে থাকে। টেস্টিং বোর্ড ব্যবহার করলে কতগুলি সুবিধা হয়। যেমন—ডায়রেক্ট অবস্থায় সোল্ডারিং আয়রন অথবা এলিমিনেটর চালান যায়। আবার সিরিজ অবস্থায় বিভিন্ন পার্টস-এর কনটিনুইটি পরীক্ষা করা যায়। আবার কোন জায়গা শর্ট হলে টেস্টিং বোর্ডের ফিউজটি কেবলমাত্র খারাপ হয়।

এই টেস্টিং বোর্ড তৈরি করতে যা যা লাগবে তা হল—

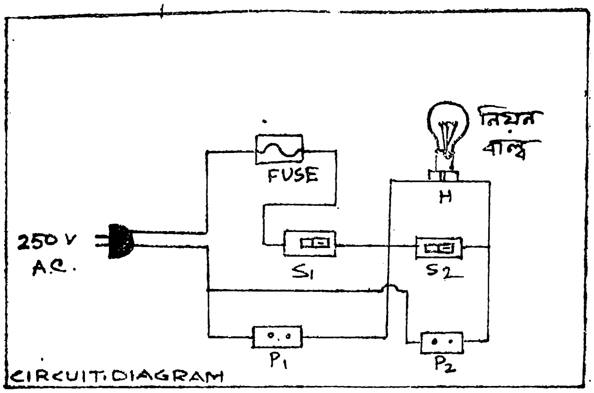

CIRCUIT DIAGRAM

(i) একটি সুইচ বোর্ড।

(ii) একটি ফিউজ কাট আউট।

(iii) একটি বটম হোল্ডার।

(iv) দুটি প্লাগ।

(v) দুটি অফ-অন সুইচ।

(vi) একটি নিয়ন বাল্ব।

(vii) কিছু তার, স্ক্রু ইত্যাদি।

এবার Circuit Diagram দেখে মডেলটি তৈরি কর।

এই বোর্ডে ব্যবহৃত প্লাগটিকে বাড়ির মেইন প্লাগ পয়েন্টে সংযোগ করতে হয়। S_1 টেস্টিং বোর্ডে ব্যবহৃত অন-অফ সুইচ, যার সাহায্যে বিদ্যুৎ প্রবাহকে অন-অফ করতে হয়। P_1 প্লাগটিকে সোল্ডারিং আয়রন, টেবিল ল্যাম্প অথবা এলিমিনেটর চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। H বটম হোল্ডার। এই বটম হোল্ডারে একটি নিয়ন বাল্ব ব্যবহার করতে হয়। P-2 প্লাগটিকে সিরিজে কোন ট্রান্সফরমার কয়েল অথবা লাউড স্পীকারের কনটিনিউটি পরীক্ষা করা যায়। এই টেস্টিং বোর্ডে যেন ডায়োড এবং ট্রানজিস্টার পরীক্ষা না করা হয়।

নবদ্বীপ, হিন্দু স্কুল

আই-কিউ টেস্ট
মে—1986

1. 2681, 3721, 5041, 6561, 8271 সংখ্যাগুলির মধ্যে কোনটি বে-মানান।

2. প্রথম কলামের নামগুলির সঙ্গে দ্বিতীয় কলামের নামগুলি সঠিকভাবে যুক্ত কর:

(a) গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া	(a) দিল্লী
(b) অম্বর প্যালেস	(b) পাটনা
(c) নালন্দা	(c) বোম্বাই
(d) আগ্রাদুর্গ	(d) জয়পুর
(e) কুতব মিনার	(e) আগ্রা

3. 'কোন লোকই ভালো নয়, তবে কিছু লোক খারাপ নয়'—এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে কোনটি সত্যঃ

(a) সব লোকই খারাপ নয়

(b) কোন লোকই খারাপ নয়

(c) সব লোক ভালো নয়।

4. আর্জেন্টিনার অধিকাংশ লোক কোন ভাষায় কথা বলেন?

(a) স্প্যানিশ, (b) ফরাসী, (c) ইংরাজী, (d) জার্মানি।

5. মশার বংশবৃদ্ধি বন্ধ করতে জলাশয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়:

(a) ব্লিচিং পাউডার, (b) কলিচুন, (c) কেরোসিন তেল (d) ডি. ডি. টি.

প্রশ্নোত্তর

'ধূমকেতু' সম্বন্ধে প্রশ্ন রেখেছো নালিয়া পাল—ডিব্রুগড় থেকে **সুজিত চক্রবর্তী**, সূর্যডোবার সময় সূর্যকে লাল দেখাবার কারণ জানতে চেয়েছো মুর্শিদাবাদ থেকে **মহঃ তারুজ্জমান**; অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় গায়ে বাতের ব্যথা কেন জাগে—এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছো দিনহাটা, কোচবিহার থেকে **বিপুল আচার্য**; বেহালা কলিকাতা থেকে **প্রশান্ত সরকার** প্রশ্ন করেছো নীল রঙের কাচের ভেতর দিয়ে লাল জিনিসকে দেখলে কেন কালো দেখায়; পৃথিবীর চুম্বকত্বের কারণ জানতে চিঠি লিখেছো হাবড়া-24 পরগনা থেকে **বিপ্লব মণ্ডল ও প্রদীপ্ত মণ্ডল** এবং বাথাসন-মালডাঙ্গা-বর্ধমান থেকে **অশোক কুমার পাল**; শীতকালে ঠোঁট ও পায়ের গোড়ালি ফাটার কারণ জানতে চেয়েছো 2নং শ্যামবাজার—বর্ধমান থেকে তাপস অধিকারী, নক্ষত্র কেন ঝিকমিক করে—জানতে চেয়েছো সমরেশ মাজী, দেউলপোতা—নেধুয়াবাজার মেদিনীপুর থেকে এবং ব্লাক হোল সম্বন্ধে জানতে চেয়েছো শ্রীরামপুর, মহেশ থেকে পার্থপ্রতিম আইচ ও ধ্রুবজ্যোতি আইচ।

তোমাদের সবার উত্তরের জন্যে পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলি দেখ।

হরিশপুর-গোসাবা-24 পরগনা থেকে ভাস্কর চক্রবর্তী প্রশ্ন পাঠিয়ে উত্তর পাওনি লিখেছো। অভিযোগ করেছো, প্রশ্নোত্তর বিভাগে কেবল শহরের ছেলের চিঠির উত্তর দেওয়া হয়।

তোমার ধারণা যে আদৌ ঠিক নয় তা নিয়মিতভাবে প্রশ্নোত্তর বিভাগ দেখলে বুঝতে পারবে। তোমাকে আরও জানাই যে, প্রশ্নোত্তর বিভাগে প্রতি মাসে শতাধিক চিঠি আসে এবং প্রতিটি প্রশ্ন ও প্রশ্নকর্তার নাম লিখে নেওয়া হয়। তোমার চিঠি কিন্তু জমা পড়েনি বা বর্তমান চিঠিতেও-কোন প্রশ্ন পাঠাওনি।

প্রশ্নোত্তরের জন্য পৃষ্ঠাও সীমিত। তবু-গত মে-85 থেকে পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়ানোও হয়েছে। শুধু প্রশ্ন ও উত্তর দিয়ে তো পত্রিকাটি পূর্ণ করা চলে না, তাই কিশোর মনে যাতে বিজ্ঞান চেতনা জাগে এবং অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকা যাতে উপকৃত হন তার জন্য নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্নকে বাদ দিয়ে আর সব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করা হয়—তবে সময় লাগে যথেষ্ট।

তোমার অভিযোগটিও ভিত্তিহীন। এখানে গ্রাম-শহর কাউকে উপেক্ষা করা হয় না। তরুণ মনে বিজ্ঞান চেতনা জাগানোর জন্যে এর সম্পাদকমণ্ডলী সুদূর গ্রামেও—'বিজ্ঞান পরিষদ' গঠনের জন্য যত্নের কোন ত্রুটি করছেন না। এর লেখকগোষ্ঠীর অনেকেই গ্রামে থাকেন—এমনকি স্বয়ং উত্তরদাতাও। অতএব প্রশ্ন পাঠাবে। উত্তর অবশ্যই পাবে।

প্রঃ বাংলা ও ইংরাজী মাসের নামকরণ কিভাবে করা হয়েছে? মনিরুজ্জমান, কলসুর উচ্চবিদ্যালয়—কলসুর 24 পরগনা।

উঃ বাংলা মাসের নামকরণ নক্ষত্রের নামে করা হয়েছে। অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় জ্যোতিষীরা সূর্য ও চন্দ্রের প্রতীয়মান গতিপথ নির্ণয়ের জন্য মহাকাশে এক কটি-বেষ্টনী তথা 'ভ চক্র' বা নক্ষত্রচক্রের পরিকল্পনা করেছিলেন। ঐ বেষ্টনীকে বিভক্ত করেছিলেন 27 ভাগে (বৈদিক যুগে 28)। এবং প্রতিটি বিভাগকে নির্দেশ করেছিলেন এক একটি নক্ষত্রপুঞ্জের দ্বারা। সেই নক্ষত্র-পুঞ্জগুলির আবার নামকরণ করেছিলেন পুঞ্জস্থিত একটি উজ্জ্বল তারার (যোগতারা) নামে। সেগুলি যথাক্রমে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তর ভাদ্রপদ ও রেবতী।

প্রাচীনকালে মাসগণনা করা হতো এক পূর্ণিমা থেকে আর এক পূর্ণিমা পর্যন্ত মোট প্রায় ত্রিশ দিনে। দ্বাদশ পূর্ণিমা অন্তে জ্যোতিষীরা লক্ষ্য করতেন সূর্য একটি বিশেষ নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে অবস্থান করে। যেহেতু সূর্যের আলোতে তারাদের দেখা যায় না, তাই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে ও পরে পূর্ব ও পশ্চিম আকাশের নক্ষত্র-পুঞ্জকে নির্দিষ্ট রাখতেন আর নির্দিষ্ট রাখতেন পূর্ণিমার চন্দ্রকেও। যেমন বৈশাখী পূর্ণিমায় চাঁদ অস্ত যাওয়ার সময় থাকে বিশাখা নক্ষত্রের কাছে, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের কাছে ইত্যাদি। বিশেষ পূর্ণিমায় বিশেষ নক্ষত্রের কাছে চন্দ্রের অবস্থান লক্ষ্য করেই সেই নক্ষত্রের নামে চিহ্নিত করা হয়েছে মাসকে। বিশাখা থেকে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা থেকে জ্যৈষ্ঠ, পূর্বাষাঢ়া থেকে আষাঢ়, শ্রবণ থেকে শ্রাবণ, পূর্বভাদ্রপদ থেকে ভাদ্র, অশ্বিনী থেকে আশ্বিন, কৃত্তিকা থেকে কার্তিক, মৃগশিরা থেকে মার্গশীর্ষ, পুষ্যা থেকে পৌষ, মঘা থেকে মাঘ, পূর্বফাল্গুনী থেকে ফাল্গুন ও চিত্রা থেকে চৈত্র।

মার্গশীর্ষ মাস থেকে আগে বছরের প্রথম ধরা হতো তাই তার নাম অগ্র (প্রথম) হায়ন (বছর)। নক্ষত্র-গণনা ও বার মাসের নামকরণ ভারতীয়দের নিজস্ব এবং বিজ্ঞান-সম্মত।

ইংরাজী মাসগুলোর নামকরণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত কোন কারণ নেই। রোমক দেবতা জানুয়ার মাসের নামে জানুয়ারি ; ফেব্রুয়ারি অর্থে পবিত্র এবং রোমানরা ঐ মাসকে পবিত্র মনে করায় উক্ত নাম ; অন্যান্য দেবদেবী যথা মার্স-এর নামে মার্চ, এপ্রিলিসের নামে এপ্রিল, মায়ার নামে মে এবং জুনোর নামে জুনমাস।

আগে রোমানরা মার্চ মাসকে বছরের শুরু ধরতেন। তাই মার্চ থেকে সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম মাস হিসেবে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর নামকরণ।

জুলাই ও আগস্ট মাসের একটু ইতিহাস আছে। পূর্বে এ দুটি মাসের নাম ছিল কুইন্টলিস এবং সেক্সটিলিস। দুটি মাসের দিনসংখ্যা ছিল 30। জুলিয়াস সিজার যেহেতু কুইন্টিলস মাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাই সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি নিজেই মাসটির নাম পরিবর্তন করে নিজের নামানুসারে জুলাই রাখেন এবং ফেব্রুয়ারি থেকে একটি দিন কেটে নিয়ে দিনসংখ্যা 31 করেন। ঠিক একই পথ অনুসরণ করেছিলেন অগাস্টাস সিজার সেক্সটিলিস মাসে জন্ম বলে মাসটির নাম পরিবর্তন করে নিজের নাম অনুযায়ী আগস্ট রাখেন এবং ইনিও ফেব্রুয়ারি থেকে একটা দিন কেটে নিয়ে আগস্টের সঙ্গে যোগ করেন। সেই থেকে ফেব্রুয়ারির দিনসংখ্যা কমে হয়েছে 28।

প্রঃ আকাশে রামধনুর কেমন করে সৃষ্টি হয়? (1) সমীর দলুই, কল্যাণচক্র—হাওড়া (2) অমলেশ বালা—বগুলা, কলেজপাড়া, নদীয়া। (3) শাশ্বতী রায়, রামকৃষ্ণপল্লী—কলি-59

উঃ সূর্যের বিপরীতে আকাশে মেঘ থাকলে মেঘের জলীয়বাষ্প বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার দ্বারা সূর্যালোকের প্রতিসরণ ও অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের ফলে সূর্যের সাদা আলোটা বিচ্ছুরিত হয়ে আকাশের গায়ে বিভিন্ন বর্ণের বৃত্তচাপগুলির সৃষ্টি করে এবং এগুলিকে ধনুকের মত পরপর সজ্জিত দেখা যায়। বৃত্তচাপগুলির একেবারে বাইরে থাকে সবচেয়ে বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো লাল, আর ভেতরে থাকে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেগুনী আলো। মাঝখানে থাকে পরপর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনুযায়ী অপরাপর বর্ণের আলো।

প্রঃ সূর্য-তাপের কত অংশ পৃথিবীতে আসে? বিশ্বনাথপুর গদামথুরা আদর্শ-বিদ্যাপীঠের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী।

উঃ সূর্য প্রতি সেকেণ্ডে যে পরিমাণ তেজ বিকিরণ করছে তার প্রায় সমস্তই ছড়িয়ে পড়ছে মহাকাশের চারদিকে। কেবল ভগ্নাংশমাত্র লাভ করছে পৃথিবী। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, পৃথিবী জন্ম থেকে এপর্যন্ত প্রায় সাড়ে চারশ কোটি বছর ধরে যে পরিমাণ তেজ সূর্য থেকে লাভ করেছে তা সূর্যের বিকীর্ণ তেজের মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের সমান।

প্রঃ সূর্য থেকে এত তেজ কিভাবে উৎপন্ন হচ্ছে? সে কি চিরকাল এইভাবে তেজ বিতরণ করতে থাকবে? দয়াময় ভোল্লা—বোলপুর, বীরভূম

উঃ সূর্যের তেজের উৎস তার বিশাল হাইড্রোজেনের ভাণ্ডার। তার কেন্দ্রের তাপমাত্রা প্রায় দুকোটি ডিগ্রী সেলসিয়াস। উক্ত তাপমাত্রায় কোন পরমাণুই তাদের গঠন ঠিক রাখতে পারে না। পারমাণবিক বিক্রিয়ায় নানাবিধ বিবর্তনের ভেতর দিয়ে হাইড্রোজেন পরমাণু শেষ পর্যন্ত হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হয়। এরই ফলে উৎপন্ন হয় এত প্রচণ্ড তাপ এবং বলা যেতে পারে যে, এখানে হাইড্রোজেন হচ্ছে জ্বালানী এবং উৎপন্ন হিলিয়াম হচ্ছে অবশেষ বা ছাই।

সূর্যের হাইড্রোজেন ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়। ধীরে ধীরে হাইড্রোজেনের পরিমাণ কমতে থাকবে এবং হিলিয়ামের পরিমাণ বাড়তে থাকবে। ফলে তাপ ও দীপ্তি উভয়ে বাড়তে থাকবে। আর স্ফীত হয়ে উঠবে সূর্যও। অবশেষে হাইড্রোজেনের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেলে সঙ্কোচন শুরু হবে, বর্ণ হয়ে উঠবে ঘোরতর লাল—তারপর সাদা ও পরে নীল। শেষে নিভে যাবে চিরতরে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে জেনেছেন, বর্তমান সূর্যের বয়স প্রায় 500 কোটি বছর। তার জীবনের শেষ পরিণতি আসতে আরও হাজার কোটি বছর বাকি।

প্রঃ কতবার মানুষ চন্দ্রে অবতরণ করেছে? যাত্রীদের ও যানগুলির নাম কি? কল্যাণব্রত পাল, 252 গোপাললাল ঠাকুর রোড—বরানগর।

উঃ দুবার। প্রথম 1969-সালের 16ই জুলাই। যাত্রী ছিলেন এন. এ. আর্মস্ট্রং, এম. কলিনস, ও ই. ই. অলড্রিন। মহাকাশযানের নাম ছিল অ্যাপোলো-11। দ্বিতীয় বারের যাত্রী ছিলেন সি. কনর‍্যাড, আর. এফ. গর্ডন ও এ. এল. বীন। মহাকাশযানের নাম ছিল অ্যাপোলো-12। তারিখটি ছিল 1969 সালে 14ই নভেম্বর।

প্রঃ প্লুটো গ্রহের কয়টি উপগ্রহ? পিণ্টু মণ্ডল, পূর্বপারুই পাড়া—হালিশহর।

উঃ প্লুটো গ্রহটি সূর্য থেকে প্রায় 367 কোটি মাইল দূরে অবস্থিত বেশ ছোট গ্রহ। অনেক দূরের গ্রহ বলে ওর অস্তিত্বও সহজে টের পাওয়া যায় না। ঐ কারণে পাতালপুরীর দেবতা প্লুটোর নামে ওর নামকরণ। (এর আবিষ্কর্তাদ্বয় 'পার্সিভাল লাওয়েল' এবং 'টমবাউ'র নামকে জড়িয়েও অনুরূপ নামকরণ হয়েছে)। তাই উক্ত গ্রহটি সম্বন্ধে এখনও বহু তথ্য অজ্ঞাত থেকে গেছে। উপগ্রহের সংখ্যা এমনকি প্রকৃত উপগ্রহ ওর আছে কিনা তাও সঠিকভাবে বলার এখনও সময় আসেনি।

সুধাংশু পাত্র

কালিন্দী, মেদিনীপুর

শিকাগোর হে মার্কেট স্কোয়ারে ঐতিহাসিক শ্রমিক সমাবেশে পুলিশের আক্রমণ।

আজ ঐতিহাসিক মে দিবসের শতবর্ষ

Attention Workingmen!

GREAT

MASS-MEETING

TO-NIGHT, at 7.30 o'clock,

AT THE

HAYMARKET, Randolph St, Bet. Desplaines and Halsted.

Good Speakers will be present to denounce the latest atrocious act of the police, the shooting of our fellow-workmen yesterday afternoon.

Workingmen Arm Yourselves and Appear in Full Force!

THE EXECUTIVE COMMITTEE.

Achtung, Arbeiter!

Große

Massen-Versammlung

Heute Abend, 8 Uhr, auf dem

Heumarkt, Randolph-Straße, zwischen Desplaines- u. Halsted-Str.

৩ মের সংবাদপত্রে শ্রমিক সমাবেশের বিজ্ঞাপন

আজ থেকে একশ বছর আগে ১৮৮৬-র পয়লা মে শনিবার ধনবাদী সভ্যতার অবারিত শোষণের প্রতিবাদে এবং আট ঘণ্টার বেশি ফ্যাক্টরিতে না-খাটার দাবীতে শিকাগোর ৫০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট ঘোষণা করেন আর মিছিলে যোগ দেন অযুত শ্রমিক। ধর্মঘট-ভাঙা দালাল দিয়ে ম্যাক্‌কর্মিক ফ্যাক্টরি চালু রাখার চেষ্টায় বাধা দিলে ৩ মে একজন শ্রমিক পুলিশের গুলিতে মারা যান। ৪ মে হে মার্কেটের প্রতিবাদ সভায় প্রায় মধ্যরাতের চোরা আক্রমণে একজন শ্রমিক মারা যান পুলিশের গুলিতে। আর নিহত হন পুলিশ অফিসার দেগান। শহরে নিষিদ্ধ হয়ে যায় জনসভা। সিটি কাউন্সিল হুকুম জারী করে, শিকাগোর পথঘাট থেকে লাল রঙ, যা শ্রমিক আন্দোলনের রঙ, পুরোপুরি মুছে দিতে। শহর জুড়ে পুলিশি ধরপাকড়ের তাণ্ডব। দেগানের হত্যাকারী হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ৮ জন শ্রমিক নেতাকে। চারজনকে ঝোলানো হয় ফাঁসীকাঠে। দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এক জনের পনের বছরের জেল। একজন ফাঁসীর আগের দিন আত্মহত্যা করেন পুলিশি অত্যাচারে। এমন উলঙ্গ বর্বরতাতেও শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থানকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না পৃথিবীর কোনো দেশেই। নিছক উৎপাদক শক্তি থেকে তার উত্তরণ ঘটলো জাতির ভাগ্য-নির্ধারকে। আজ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ দেশে শ্রমিকরাজ। সমগ্র জনসংখ্যার ছ'ভাগের এক ভাগ মানুষ বাস করেন সমাজতন্ত্রে।

পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী অভিনন্দন

পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক শ্রেণীর এই প্রগতিশীল ভূমিকা সম্পর্কে যতখানি সচেতন, নানা উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা ও জীবনযাপনের মানোন্নয়নে ততখানিই বদ্ধপরিকর। বামফ্রন্ট সরকার বিশ্বাস করে শ্রমিক শ্রেণীকে অন্ধকারে রেখে দেশের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব নয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ-এর খবর

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের ঘনাদা ক্লাবএর সদস্যগণের অনুরোধ মতো প্রস্তাবিত বিশেষ সংখ্যা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঘনাদা সংখ্যার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

প্রস্তাবিত সূচীপত্র অনুযায়ী অনেক লেখাপত্র ইতিমধ্যে দপ্তরে জমা পড়েছে। তবে আমন্ত্রিত রচনা এখনো সব এসে পেঁছয়নি। আশা করা যাচ্ছে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে।

এপ্রিল সংখ্যার শব্দকুটের সমাধান

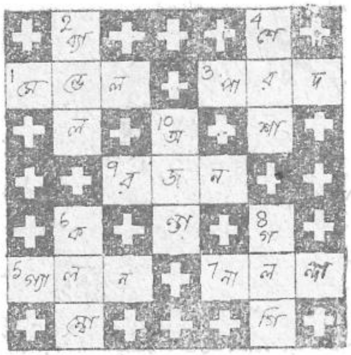

সিনিয়র/জুনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্ট, আইকিউ টেস্ট, এবং ফোটোক্যুইজ-এর উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি ....

বয়স ... ... শ্রেণী............

বিদ্যালয়ের নাম ....

আই কিউ টেস্ট/সিনিয়র/জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট ফোটো ক্যুইজ-এর উত্তর পাঠালাম

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

মে সংখ্যার সিনিয়র ক্যুইজের উপহার
অমরনাথ রায়ের **সায়েন্স ক্যুইজ**

মে-86 সংখ্যার জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ঘনাদার জুড়ি নেই

মে '86 সিনিয়র ফোটো কুইজের উপহার
আনন্দ বাগচির
মুখোশের মুখ

মে'86 জুনিয়ার ফোটো ক্যুইজের উপহার
পার্থসারথি চক্রবর্তী'র
মাটি থেকে আকাশ